মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

অষ্টাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

নবীন

অষ্টাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

আমাদের নবান্ন ২
যশোরের যশ, খেজুরের রস ৩
স্বপ্নের পদ্মা সেতু এবং এর সার্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব ৫
অংকুর: বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পুরুষ ও নারী
কৃষকের ভূমিকা ৭
কাঞ্চনজঙ্ঘা: দেশের সীমানা পেরিয়ে আসা এক
অপরূপার গল্প ১১
করোনাকালে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ১২
অতীত মহামারিগুলো থেকে নেওয়া
৫টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ১৪
মুজিব শতবর্ষ: কৈশোর-যৌবনেই
মানবসেবার হাতেখড়ি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ১৬
ক্র্যাক প্লাটুন: মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার বুকে
কাঁপন ধরানো গেরিলাদল ১৮
আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ: ফিরে দেখা ২০২০ ২১
বিটোফেন: যিনি পশ্চিমি ক্লাসিকাল
মিউজিকের ধারা বদলে দেন ২৪
অংকুর ২৫
ব্ল্যাক হোল নিয়ে গবেষণা করে SN-10 তালিকায়
তনিমা তাসনিম অনন্যা ২৬
বিসিএস প্রস্তুতি: শুরু থেকেই যা করবেন ২৭
প্রেজেন্টেশনের এ টু জেড: দ্বিতীয় পর্ব ২৮
প্রকল্প সংবাদ ৩০
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে
কে কোথায় পড়ছে ৩১
মাথায় কত প্রশ্ন আসে! ৩২

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

আমাদের নবান্ন

বাংলার মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে 'অগ্রহায়ণ মাস' ও 'নবান্ন'। অগ্রহায়ণ শব্দের অর্থ বর্ষ শুরুর মাস। আর অগ্রহায়ণের প্রথম দিনটিই বাংলাদেশে নবান্ন যাপনের দিন হিসেবে পরিচিত। দেশের প্রাচীনতম উৎসবগুলোর একটি নবান্ন উৎসব।

কার্তিক পেরিয়ে নীরবে আবির্ভাব ঘটে অগ্রহায়ণের। একসময় বাঙালির নতুন বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস দিয়ে, তাই এ মাসের নাম হয়েছে অগ্রহায়ণ। এ মাসের প্রথম দিনে উদ্‌যাপিত নবান্নই বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। বাংলার কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়ে থাকে, নবান্ন তার অন্যতম। নবান্নের শব্দগত অর্থ 'নতুন অন্ন'। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবই নবান্ন। সাধারণত, অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পরে এই উৎসব হয়। ঋতুবৈচিত্র্যে হেমন্ত আসে শীতের আগে। কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মাস নিয়েই হেমন্ত ঋতু।

নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণকে উপেক্ষা করে নবান্নকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে ওঠে। সামাজিক প্রথা, রীতি ও কৃত্যের পরিক্রমায় স্থানবিশেষে মাঘ মাসেও নবান্ন উদ্‌যাপনের প্রথা রয়েছে।

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী অগ্রহায়ণ অষ্টম মাস হিসেবে বিবেচিত হলেও হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় এ মাসের প্রথম দিনটিই বাংলাদেশের নবান্ন। বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য মেয়ে-জামাইসহ আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে নতুন চালের পিঠা ও পায়েস রান্না করে ধুমধামের সঙ্গে ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়। গ্রামের বধূরা অপেক্ষা করেন বাপের বাড়িতে নাইওরে গিয়ে নবান্ন যাপনের জন্য। পিঠা, পায়েস, মুড়ি-মুড়কি আর নতুন চালের ভাতের সুগন্ধে ভরে ওঠে মন।

কার্তিক মাসের শুরু থেকেই দেশের বিস্তীর্ণ জনপদে ধান কাটা শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে কোনো বাড়িতে দেখা যায় ঢেঁকিতে চাল কোটা হচ্ছে পিঠার জন্য, কোনো বাড়িতে তৈরি হচ্ছে পায়েস। ধর্মাচারের অঙ্গ হিসেবে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃত্য, প্রথা ও নানা রীতিতে নতুন অন্ন পিতৃপুরুষ, দেবতা, কাক ইত্যাদিকে উৎসর্গ এবং আত্মীয়স্বজনকে পরিবেশন করার পরেই গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ নতুন গুড়ে রান্নাসহ নতুন অন্ন গ্রহণ করে থাকেন। বিশেষ লৌকিক প্রথা অনুযায়ী নতুন চালের তৈরি খাদ্যসামগ্রী কাককে নিবেদন করা নবান্নের একটি অঙ্গ। প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে, কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃত ব্যক্তির আত্মার কাছে পৌঁছে যায়।

বাংলার লোকছড়ায় এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, 'কো কো কো,/আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।/শুভ নবান্ন খাবা, কাকবলি লবা?/পাতি কাউয়া লাঠি খায়,/দাড় কাউয়া কলা খায়,/কো কো কো,/মোর গো বাড়ি শুভ নবান্ন।' কাকের উদ্দেশ্যে দেওয়া নৈবেদ্যকে বলে 'কাকবলী'। অতীতে পৌষসংক্রান্তির দিনও গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করার প্রথা ছিল। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, নতুন ধান উৎপাদনের সময় পিতৃপুরুষ অন্ন প্রার্থনা করে থাকেন। এ কারণেই পার্বণ কৃত্য অনুযায়ী নবান্নে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করা হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। তবে এসব প্রাচীন প্রথা এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।

বাংলার সব মানুষের অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসেবেই মুখ্যত নবান্ন সমাদৃত। নবান্ন উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় ঘরের দাওয়ায়, বাড়ির উঠোনে, রাস্তার মোড়ে, স্কুলের আঙিনায় চলতে থাকে নবান্নের নাচ, নবান্নের গান, লোকগীতি, লালনগীতি, বাউলগান, সাপখেলা, বানরখেলা, লাঠিখেলা

ইত্যাদি বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। এ উপলক্ষে অঞ্চলভেদে পরিবেশিত হয় জারি, সারি, মুর্শিদি, পালা ও বিচারগান। আর মেলায় পাওয়া যায় নানা স্বাদের খাবার। ছোটদের বাড়তি আনন্দ দিতে গ্রাম্য মেলায় দেখা যায় নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস, বায়োস্কোপ, পালকিনাচ ও বড়দের জন্য যাত্রা-নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ সময় প্রকৃতিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। অগ্রহায়ণ মাসেই ফসলের খেতে সোনালি হাসি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বাতাসে উড়ে বেড়ায় নতুন ধানের ঘ্রাণ আর ফুলের সৌরভ। এর সঙ্গে প্রকৃতিতেও পাওয়া যায় শীতল ছোঁয়া। সকাল-সন্ধ্যায় দেখা মেলে হেমন্তের মৃদু কুয়াশার।

বাংলায় আনন্দের উৎসব হিসেবে নবান্ন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে এখন একই সঙ্গে লোক ও জাতীয় উৎসব। নবান্ন যখন সমাজের দশজনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত, তখন ব্যক্তি বা পরিবারের ভূমিকার চেয়ে সামষ্টিক সমাজের একত্র আনন্দই এখানে মুখ্য। নবান্নের এই উৎসব ব্যক্তি, পরিবার, স্থান, কাল বা ধর্মের সীমানা দ্বারা আবদ্ধ না হয়েও এর সব কটিকেই ধারণ করে। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে কৃষকেরা এই উৎসব পালন করে থাকেন। সে সময় কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল কাটার আগে বিজোড়সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হয় এবং বাকি অংশ চাল করে পায়েস রান্না করা হয়।

নবান্ন, অগ্রহায়ণ এবং হেমন্ত নিয়ে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদেরও আগ্রহের শেষ নেই যেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/ জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে/ শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/ রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার/ স্বর্ণ শ্যাম ডানা মেলি।...'। 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'ঋতু খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণির সওগাত?/ নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হলো মাৎ।/ 'গিন্নি পাগল' চালের ফিরনী/ তশতরি ভরে নবীনা গিন্নি/ হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত/ শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত।'

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। নবান্নকে কেন্দ্র করে অগ্রহায়ণের শুরুতেই আমাদের গ্রামবাংলায় চলে নানা নানা আয়োজন। হেমন্ত এলেই দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ ছেয়ে যায় হলুদ রঙে। এই শোভায় বিমোহিত কৃষকের মন আনন্দে নেচে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির জীবনে নতুন বার্তা নিয়ে আগমন ঘটে অগ্রহায়ণের। নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি করা পিঠা, পায়েস, ক্ষীরসহ হরেক রকম সুস্বাদু খাবারের গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। নবান্ন শস্যভিত্তিক একটি লোক-উৎসব। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। অধিক শস্যপ্রাপ্তি, বৃষ্টি, সন্তান ও পশুসম্পদ কামনা এ উৎসব উদ্‌যাপনের প্রধান কারণও বটে।

আমিরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর ২০২০

যশোরের যশ, খেজুরের রস

যশোরের আট উপজেলায় সাত লাখ ৯১ হাজার ৫১৪টি খেজুরগাছ আছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি যশোর সদর, মণিরামপুর, শার্শা, চৌগাছা ও বাঘারপাড়া উপজেলায়। গত বছর জেলায় চার হাজার ৬৪ মেট্রিক টন গুড়-পাটালি ও প্রায় দুই হাজার ৫৬০ মেট্রিক টন রস উৎপাদন হয়েছে। স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিয়ে এসব গুড়-পাটালি দেশের অন্যান্য জেলায়ও যাচ্ছে।

আবহমানকাল থেকেই দেশবাসী পরিচিত–'যশোরের যশ, খেজুরের রস' প্রবচনটির সাথে। শীতের শুরুতে খেজুরের রস, গুড় আর পাটালির জন্যে দেশের মানুষ উদগ্রীব হয়ে থাকে এর স্বাদ-গন্ধ নিতে। আর শহরে থাকা আত্মীয়স্বজনদের সমাগম ঘটে গ্রামের বাড়িতে, স্বজনদের কাছে। শীতের পিঠা-পায়েস খাওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য।

গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, গাছিদের অনাগ্রহ ও ন্যায্যমূল্যের অভাবে কিছুটা ভাটা পড়েছে এই শিল্পে। নানা সংকটের মধ্যেও এই অঞ্চলের খেজুরের পাটালি আর গুড়ের উৎপাদন ও বিকিকিনি চলছে। এখানেই মেলে বিখ্যাত নলেন গুড়।

যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, যশোরের আট উপজেলায় সাত লাখ ৯১ হাজার ৫১৪টি খেজুরগাছ আছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি যশোর সদর, মণিরামপুর, শার্শা, চৌগাছা ও বাঘারপাড়া উপজেলায়। গত বছর জেলায় চার হাজার ৬৪ মেট্রিক টন গুড়-পাটালি ও প্রায় দুই হাজার ৫৬০ মেট্রিক টন রস উৎপাদন হয়েছে। স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিয়ে এসব গুড়-পাটালি দেশের অন্যান্য জেলায়ও যাচ্ছে।

তবে জেলায় আগের মত খেজুর গাছ নেই, একইসাথে গাছির সংখ্যাও কমছে। অভিজ্ঞ গাছি ছাড়া রস সংগ্রহ করা যায় না। গাছিদের পরবর্তী প্রজন্ম খুব বেশি এই পেশায় আগ্রহী হচ্ছে না। সংকটের আরেকটি কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিশ্রম ও উৎপাদন খরচ অনুযায়ী গুড়-পাটালির ন্যায্য দাম না পাওয়া।

গাছিদের নৈপুণ্যে তৈরি এক বিস্ময় নলেন গুড়!

যশোরের খাজুরা এলাকার গুড়-পাটালির এমনই সুঘ্রাণ ছড়িয়েছে, যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তৈরি গুড়-পাটালি এর কাছে একেবারেই নগণ্য।

এই এলাকাতেই পাওয়া যায় দেশসেরা নলেন গুড়। নলেন গুড় আসে এক বিশেষ ধরনের

খেজুর রস থেকে। যা এই এলাকার মানুষের কাছে নলেন রস বলে পরিচিত। নলেন গুড় থেকে তৈরি হয় নলেন গুড়ের সন্দেশ, ক্ষীর-পায়েস।

আশ্বিনের শেষের দিকে গাছিরা খেজুরগাছকে প্রস্তুত করতে থাকেন রস আহরণের জন্যে। গাছের বাকল কেটে চেছে 'গাছ তোলা' হয়। যেখান থেকে নেমে আসবে অমিয়ধারা-তা সাফ-সুতরো করতে থাকে গাছিরা। এক একজন সুদক্ষ স্বশিক্ষিত গাছি কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ধারাল গাছিদা দিয়ে পরম নৈপুণ্যে তা কাটে!

রস উৎপাদনে গাছিরা যে পরিশ্রম করে সে তুলনায় তাতের প্রাপ্তি খুবই কম

গাছতোলা শেষে গাছ কাটার পালা, অর্থাৎ রস বেরুনোর পথ তৈরি করা। নিপুণ হাতে গাছের উপরিভাগের নরম অংশকে অপরূপ সৌন্দর্যে কেটে গাছি সেখানে বসিয়ে দেন বাঁশের তৈরি নালা। গাছের কাটা অংশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে রস এসে নল দিয়ে ফোটায় ফোটায় জমা হয় ঠিলেয় (হাঁড়ি)। প্রথম রস একটু নোনা। গাছি এক কাটের পর বিরতি দেন! কিছুদিন বিরতির পর আবার কাটেন। এবারের রস সুমিষ্ট যার মৌ মৌ সুগন্ধ ছড়ায় চারদিকে। সুবাস আর স্বাদ নিতে ভিড় জমায় পিঁপড়া, মৌমাছি, পাখি, কাঠবিড়ালি। এই রসের নামই নলেন রস যা গাছিদের নৈপুণ্যে তৈরি এক বিস্ময়।

যশোরের নলেন গুড়-পাটালির জন্যে বিখ্যাত খাজুরা এলাকার গাছি আব্দুর জলিল (৫০) বলেন, ঝুঁকি নিয়ে গাছ কাটতে হয়। ভোরে গাছ থেকে রস নামানো খুব কঠিন কাজ। এরপর জ্বালিয়ে গুড়-পাটালি তৈরি করে বিক্রি করতে হয়। এতো কষ্ট করার পরও ভাল দাম পাওয়া যায় না। কষ্টের তুলনায় লাভ হয় না। এ জন্য আগের মত যেমন গাছ নেই, তেমনি গাছিও কমছে।

অনলাইনে গুড়-পাটালি বিক্রি

গত বছর থেকে যশোরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে গুড়-পাটালি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে। এতে বাজার কিছুটা সম্প্রসারণ হচ্ছে।

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান কেনারহাটের উদ্যোক্তা নাহিদুল ইসলাম বলেন, 'গত বছর বাঘারপাড়ার ৬০ জন গাছির সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম। তাদের তৈরি সাত টন গুড় পাটালি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেছি। স্থানীয় বাজারের তুলনায় দাম বেশি দিয়েছি। নির্ভেজাল পণ্যের চাহিদা বেশি হওয়ায় দাম বেশি ছিল। ক্রেতাদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। এবার বাঘারপাড়ার পাশাপাশি কেশবপুর ও মণিরামপুরের প্রায় দুইশ কৃষককে যুক্ত করছি। গত বছরের তুলনায় এবার দ্বিগুণ টার্গেট করছি। গুড় পাটালি বাজার সম্প্রসারণ করতে পারলে গাছিরা দাম বেশি পাবে 'কেনারহাট কেজিপ্রতি পাটালি ৩৯০ টাকা এবং গুড় ৩৫০ টাকা। দেশের যেকোনও স্থানে তারা সরবরাহ করছেন।'

রসে নিপাহ ভাইরাস

নিপাহ ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয় কৃষকরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তারা খেজুর গাছের গাছের পাতা ও ফাতা (পাতার গোড়া থেকে বিস্কুট রঙের চওড়া কাগজের মতো) বেঁধে দেন। এতে করে বাদুড়সহ যেকোনও পাখি সেই গাছের রস পানে বাধা পায়।

বাঘারপাড়া উপজেলার দোহাকুলা গ্রামের কৃষক হারুণ মোল্যা বলেন, 'শুনিছি বাদুড় রস খাতি আইসে অসুক (রোগ) ছাড়াচ্ছে। এখন যে রস খাওয়ার জন্যি, সেই গাছের বাগলো (পাতা) চিরে নলের পাশতে ঠিলের মুক (মুখ) পর্যন্ত জড়ায়ে বাইন্দে রাখি। তাতে বাদুড় ক্যান, কোনও পাহি (পাখি) বসতি পারে না।'

যশোরের সিভিল সার্জন বলেন, খেজুর রসে নিপাহ ভাইরাস ছড়ায় মূলত বাদুড়ের লালা, বিষ্ঠা ও প্রস্রাবের মাধ্যমে। বাদুড় যখন খেজুর গাছের নলিতে বসে রস পান করে, সেই সময় তার লালা, বিষ্ঠা ও প্রস্রাব রসের ভাড়ে যায়। তবে, রস যদি একটু জ্বালিয়ে পান করা যায়, তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

সিভিল সার্জন বলেন, এর এন্টিভাইরাল কোনো ওষুধ নেই। আক্রান্ত রোগীদের সাধারণ চিকিৎসা দেওয়া হয়। যেহেতু স্পেসিফিক ওষুধ নেই, সেক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্তদের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মারা যায়। তাই সতর্কতাই বেশি জরুরি।

গুড়-পাটালিতে চিনি

অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে যশোরের বিখ্যাত খেজুরের পাটালির সুনাম হারাতে বসেছে। শীত মৌসুমে শহরের অলি-গলি ও দোকানে যে পাটালি-গুড় পাওয়া যায়, তার বেশিরভাগই ভেজাল। কম দামের চিনি মিশিয়ে খেজুরের পাটালি বলে তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি করা হয়।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খেজুরের রস যখন জ্বালানো হয়, সেই সময় আখের গুড়ের 'মুচি' (পাটালির মতো শক্ত) ও পুরনো গুড় (উলা গুড়) সঙ্গে মিশিয়ে ঘন করা হয়। এরপর তাতে চিনি মিশিয়ে 'বীজ' মেরে পাটালি তৈরি করা হয়। পাটালির গন্ধ করতে তাতে বিশেষ কেমিক্যাল ব্যবহার করে তারা। এরপর সেই পাটালি বা গুড়কে খাঁটি বলে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ৫০ টাকার কেজি দরের চিনি আর ৭০ টাকা দরের আখের গুড়ের মুচি দিয়ে তৈরি এসব পাটালি দুইশ' থেকে আড়াইশ' টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

যশোরের বসুন্দিয়া এলাকার কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের এলাকায়ও বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা এই ভেজাল পাটালি তৈরি করে। তারা কমদামে উলা গুড় কিনে তাতে চিনি, সেন্ট আর পাটালির রং ঠিক রাখতে একটি কেমিক্যাল ব্যবহার করে।

আছেন অনেক সৎ গাছি

প্রায় ৪০ বছর গুড়-পাটালি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার দোহাকুলা গ্রামের কৃষক হারুণ মোল্যা (৬৮)। তিনি বলেন, 'আমার ৭০টি খেজুর গাছ আছে। প্রতিদিন ১০টি করে গাছ কাটি আমি। ৫-৬ খান (ভাড়) রস হয়। এখন বেশিরভাগ দিনই কাঁচারস বিক্রি করি। আজও বেঁচেছি দুই ঠিলে (ভাড়) ২৪০ টাকায়।'

তিনি বলেন, 'তিন মেয়ে আর নাতি-পুতি এসেছিল। যাওয়ার সময় তারা ৫ কেজি করে পাটালি নিয়ে গেছে। ছোটমেয়েকে একটু বেশি দিতে হবে, জানিয়ে গেছে।'

জীবনে কখনও হারাম খাইনি জানিয়ে তিনি বলেন, 'শুনেছি এখন কেউ কেউ গুড়-পাটালিতে চিনি দিয়ে তা বিক্রি করছে। আমি কখনোই এসব করিনি, করবোও না।'

এক সপ্তাহ গাছ কাটলে যে রস পাওয়া যায়, তা দিয়ে তিনি ২৫ থেকে ৩০ কেজি গুড়-পাটালি তৈরি করতে পারেন বলে জানান। তার পাটালি দুইশ' টাকা আর গুড় দেড়শ' টাকায় গ্রামেই বিক্রি হয়ে যায়।

বাঘারপাড়া পৌরসভার মধ্যপাড়া এলাকার কৃষক শমসের আলী (৬৫) বলেন, ১২০টি গাছ আমার। পাঁচ দিন পর গাছ কাটি। এক ছেলে, অনার্স পড়ে। সে গাছ কাটতে পারে না, কখনো যায়নি আমার সঙ্গে। কাঁচা রস প্রতি ঠিলে দেড়শ' টাকা দরে বিক্রি করে দেই। ঢাকার থেকে অর্ডার আসে, পাটালি আড়াইশ' টাকা করে বিক্রি করি। কোনো প্রকার ভেজালের সঙ্গে আমরা নেই।

তৌহিদ জামান
bangla.dhakatribune.com

স্বপ্নের পদ্মা সেতু এবং এর সার্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব

বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের সেতু পদ্মা সেতুর কাঠামো আজ দৃশ্যমান। ১০ ডিসেম্বর পদ্মা সেতুর ৪১নং স্প্যানটি নদীর ওপর স্থাপনের মাধ্যমে স্বপ্নের সেতু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার, রোড ভায়াডাক্ট ৩ দশমিক ৮ কিলোমিটার, রেল ভায়াডাক্ট শূন্য দশমিক ৫৩২ কিলোমিটার; অর্থাৎ সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ১০ দশমিক ৪৮২ কিলোমিটার।

নদীর ভাঙন থেকে সেতু ও উত্তর তীর (মাওয়া সাইড) রক্ষার জন্য দুই কিলোমিটার নদী শাসন করা হচ্ছে। নদীর দক্ষিণ তীর (জাজিরা সাইড) রক্ষার জন্য প্রায় ১৩ কিলোমিটার নদী শাসন করা হবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় নদী শাসনের ব্যাপ্তি বাড়তে পারে।

সেতুর মাওয়া প্রান্তে ২ দশমিক ৩ কিলোমিটার এবং জাজিরা প্রান্তে ১২ দশমিক ৮ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ খরচের বিষয়ে দেশের মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্ন নিরসনকল্পে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট একনেকে অনুমোদিত পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা (১ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। শুধু সড়ক সেতু নির্মাণের পরিকল্পনায় এর দৈর্ঘ্য হিসাব করা হয়েছিল ৫ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদের শেষের দিকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। জানুয়ারিতেই সেতুর বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র-নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Maunsell-Aecom-কে নিযুক্ত করা হয়।

ডিজাইন পরামর্শক কাজ শুরু করলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ১ হাজার মিলিয়ন ডলার, এডিবি ৫০০ মিলিয়ন ও জাইকা ৩০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের ইঙ্গিত দেয়। সেতু বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রস্তাবিত চার লেন-বিশিষ্ট সড়ক সেতুর ডিজাইন পরিবর্তন করে ডেনমার্কের একটি সেতুর অনুরূপ দ্বিতল সেতুর ডিজাইন প্রস্তাব করে, যা সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা গ্রহণ করে। সেতু নির্মাণের প্রাক্কলিত খরচ সংশোধন করে ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ ১৬ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা) নির্ধারণ করা হয়। ইস্পাতের তৈরি অবকাঠামোর ওপর নির্মিত চার লেন-বিশিষ্ট সড়ক সেতুর নিচ দিয়ে হবে রেল সেতু। ডিজাইন প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্ভাব্য ঋণও চূড়ান্ত হয়। বিশ্বব্যাংক ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন, এডিবি ৬১৫ মিলিয়ন, জাপান ৪৩০ মিলিয়ন ও আইডিবি ১৪০ মিলিয়ন ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পরবর্তী সময়ে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরই মধ্যে সেতুর ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা বা ২ হাজার ৯৭২ মিলিয়ন ডলার। সংশোধিত ডিপিপি ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি একনেকে অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আমি ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেতু বিভাগের সচিব পদে যোগদান করি এবং উন্নয়ন সহযোগী, প্যানেল অব এক্সপার্টস, ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং পদ্মা সেতু প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে সেতু প্রকল্পের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ যেমন ডিজাইন প্রণয়ন, প্রিকোয়ালিফিকেশন দলিলপত্র ও টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুত, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর, জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকা স্থাপন ইত্যাদি এগিয়ে নিয়ে যাই।

২০১১ সালের জুলাই-আগস্টে উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক (লিড পার্টনার) প্রকল্পে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তোলে এবং সেপ্টেম্বর থেকে প্রকল্পের কাজ স্থগিত করে দেয়। সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাংকের একজন ভাইস প্রেসিডেন্টসহ একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করলে প্রধানমন্ত্রী তাদের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে বলেন।

পানি অনেক দূর গড়ায়। বিশ্বব্যাংক কানাডীয় প্রতিষ্ঠান এসএনসি লাভালিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে কানাডীয় রয়াল মাউন্টেড পুলিশের (আরসিএমপি) কাছে নালিশ করে। পরে তদন্ত করে আরসিএমপি কানাডীয় আদালতে মামলা করে।

২০১২ সালের ২৮ জুন বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট জয়েলিক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করলে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীও প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়।

বিশ্বব্যাংককে পদ্মা সেতু প্রকল্পে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের কঠিন শর্তে রাজি হয়ে যায়। সেতু সচিব অর্থাৎ আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় এবং যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে পদত্যাগ করানো হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত শুরু করে এবং

বিশ্বব্যাংক নিয়োজিত তিন সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী আইনজ্ঞ প্যানেলের চাপে কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করে। বিশ্বব্যাংক দুদকের কাজে সন্তুষ্ট হয় না। তারা সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের বিরুদ্ধেও মামলা করতে বলে। দুদক আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। সরকার আমাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে। ৪০ দিন কারাভোগের পর আমি জামিনে মুক্ত হই। বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুতি মতো পদ্মা সেতুর কাজে ফিরে আসেনি। বিশ্বব্যাংকের গড়িমসির কারণে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। ২০১৫ সালে পদ্মা সেতুর কাজের উদ্বোধন এবং ২০১৭ সালে নদীর বুকে পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান স্থাপিত হয়। সর্বশেষ স্প্যানটি ১০ ডিসেম্বর বসানোর পর এখন বাকি থাকে সড়ক ও রেললাইন বসিয়ে রোড ও রেল ভায়াডাক্টগুলোর সঙ্গে সেতু সংযুক্তকরণ এবং যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা। আশা করা যাচ্ছে, ২০২১ সালের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ করে ২০২২ সালের প্রথম দিক বা মাঝামাঝি সময়ে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণের আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নের সাফল্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয় এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের টানাপড়েন, ঋণ স্থগিত ও দীর্ঘসূত্রতার ফলে পদ্মা সেতুর বাস্তব কাজ কয়েক বছর পিছিয়ে যায়। যেখানে ২০১৪ সালে পদ্মা সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এ কাজ শেষ হবে ২০২১ সালে। কাজ শুরু ও শেষ করতে বিলম্ব এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর সেতুর সর্বশেষ প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সব প্রকল্পেই ব্যয় বেশি হয়। কারণ নির্মাণসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞ সেবা বিদেশ থেকে আমদানি ও ধার করতে হয়।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশে এর অর্থনৈতিক প্রভাব কী হবে, এ বিষয়ে সেতুর ডিজাইন পরামর্শক মনসেল-এইকম ২০১০ সালে এক বিশ্লেষণে বা স্টাডি রিপোর্টে সেতুর বেনিফিট-কস্ট রেশিও (বিসিআর) ১ দশমিক ৭ এবং ইকোনমিক ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (ইআইআরআর) ১৮ শতাংশ উল্লেখ করে। সেতু নির্মাণ ব্যয় যুক্ত হয়ে বিসিআর ২ দশমিক ১ এবং ইআইআরআর দাঁড়াবে ২২ শতাংশ। এর অর্থ হলো, এ সেতু নির্মাণ অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক হবে। দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ দূরত্ব ২ থেকে ৪ ঘণ্টা কমে যাবে। রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সহজ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কাঁচামাল সরবরাহ সহজলভ্য ও শিল্পায়ন প্রসার হবে, অর্থাৎ ছোট-বড় নানা শিল্প গড়ে উঠবে এবং কৃষির উন্নয়ন হবে। ডিজাইন পরামর্শক ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের স্বাধীন পরামর্শক এবং সেতু বিভাগ নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানও সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে। এসব সমীক্ষা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলের বার্ষিক জিডিপি ২ শতাংশ এবং দেশের সার্বিক জিডিপি ১ শতাংশের অধিক হারে বাড়বে।

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এ সেতু নির্মাণের ফলে দেশের সমন্বিত যোগাযোগ কাঠামোর উন্নতি হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে (এন-৮) ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হবে। সেতুর উভয় পাড়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও প্রাইভেট শিল্পনগরী গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ বাড়বে এবং বাড়বে কর্মসংস্থান। মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর সচল হবে। পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং দক্ষিণ বাংলার কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার, মাওয়া ও জাজিরা পাড়ের রিসোর্টসহ নতুন পুরোনো পর্যটনকেন্দ্র দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হবে। বর্তমানে ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী পদ্মা নদী পার হয়ে যেখানে ১২ হাজার যান চলাচল করে, সেখানে সেতু খুলে দিলেই যান চলাচল দ্বিগুণ হতে পারে এবং প্রতি বছর যানবাহন ৭-৮ শতাংশ বেড়ে ২০৫০ সালে ৬৭ হাজার যানবাহন চলবে। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ আমরা বিশ্বাসযোগ্য ধরে নিতে পারি। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতুর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে যানবাহন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোগ-চাহিদা বৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছিল, বাস্তবে প্রসার ঘটেছে আরো বেশি।

পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচলে টোল হার নির্ধারণের আগেই বিতর্ক শুরু হয়েছে যে জনগণের করের অর্থে নির্মিত সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচলে টোল দিতে হবে কেন? আমার মতে, এটি একটি অহেতুক বিতর্ক। বিশ্বের সব দেশেই ব্রিজ, হাইওয়ে, টানেল প্রভৃতিতে যান চলাচল টোল দিতে হয়। যে উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয় নির্বাহ করা হোক না কেন, নির্মাণব্যয় পরিশোধ বা ফেরত দেয়ার বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তো আছেই। বাংলাদেশেও বড় বড় সেতু ও মহাসড়কে টোল প্রদানের প্রথা চালু রয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ২৯ হাজার ৯০০ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেতু বিভাগ। ১ শতাংশ সুদসহ এ ঋণ ৩৫ বছরে ১৪০ কিস্তিতে শোধ করতে হবে। কাজেই এমন হারে টোল নির্ধারণ করতে হবে, যাতে টোলের টাকায় ঋণ পরিশোধ ও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। টোলের পরিমাণ বর্তমানে ফেরি পারাপারের ব্যয়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বাড়ালে যে উপার্জন হবে, তাতে নিয়মিত নির্ধারিত কিস্তি পরিশোধ সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। এ সেতুর দৈর্ঘ্য যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতুর দ্বিগুণ। কাজেই টোল হার স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। অর্থনীতিবিদদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বাস যে পদ্মা সেতু সচল হলে দেশের সার্বিক দারিদ্র্য সূচক কমবে। মানুষের আয়-রোজগার বাড়বে। যোগাযোগ উন্নয়নসহ দেশের মানুষের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, মানব উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতি হবে। যানবাহনের টোল প্রদান ও টোল আয়ও এ প্রবৃদ্ধিতে যুক্ত হবে।

শেষ কথা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক সূচকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প নিজের টাকায় বাস্তবায়ন করার সাহসী সিদ্ধান্ত ও কৃতিত্বের কারণেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা সারা বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এই একটি মাত্র আত্মবিশ্বাসী যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দৃঢ়চেতা, সফল, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সারা বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্য, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও আমাকে অনেক অপবাদ সহ্য করতে ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এ সেতু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো আমারও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

■ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব ও সেতু বিভাগের সাবেক সচিব
বর্তমানে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত
বণিক বার্তা, ২১ ডিসেম্বর ২০২০

আজিজুল হক হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

'বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পুরুষ ও নারী কৃষকের ভূমিকা'

আয়শা সিদ্দিকা
সদস্য: ৯৩০/২০১১

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৯-'২০ তে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ৩টি রচনা নবীন পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের সংখ্যায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি প্রকাশ করা হলো

শীতে মরি ঠান্ডায়, চৈতে মরি খরায়
বৈশাখে ঝড় দিরিম দিরিম, বর্ষা বাদল ঝরায়
আমি থাকি খোলা অঙ্গে তোমার বস্ত্র বুনে
এক কাপড়ে জনম গেল বাপ-ব্যাটার সনে
এক বেলা খায় মায়ে-ঝিয়ে আরেক বেলা পুত
বাপে থাকে উপোস করে ক্ষুধার জ্বালায় ভূত।

কবির এ কবিতা কল্পনার নয়, বাস্তবের। যে কবিতা সকল প্রশ্নকে উচ্চকিত করে দিয়ে সংশয়কে কাটিয়ে মহাকালের বুকে বীর সন্তানদের উজ্জ্বল করে নিজ মহিমায়। একবিংশ শতকের প্রথম পাদে দাঁড়িয়ে সে এখন ঘরকুনো নয়, সে নতুন বিশ্বপথিক। সমাজের মেরুদন্ড সেই কৃষক সমাজের, সেই বীর সন্তানেরসভ্যতা বিনির্মাণে রয়েছে সশব্দ পদচারণা। মেরুদন্ডের ওপর ভর করে যেমন একটি মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি একটি সমাজও কৃষকদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। কেননা, সমাজের মানুষ কৃষকদের উৎপাদিত অন্ন খেয়েই জীবনধারণ করে।
কৃষকই সকলের জন্য অন্নের সংস্থান করেন। আর তাই কৃষক সমাজের জয়গান গেয়ে কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী তাঁর 'চাষি' কবিতায় লিখেছেন:

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?
পুন্য অত হবে নাক সব করিলেও জড়।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইকো গর্ব লেশ।

কৃষি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Agriculture, শব্দটি ল্যাটিন এজার এবং কালচার শব্দদ্বয় দিয়ে গঠিত। এজার শব্দের অর্থ মাঠ বা মাটি এবং কালচার শব্দের অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা। অর্থাৎ Agriculture শব্দের অভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় ভূমিকর্ষণ বা মাটি চাষ করা। এর অতিপরিচিত বাংলা শব্দ কৃষি। কালচার শব্দের সরল বাংলা ছিল কৃষ্টি। এটি কৃষির সমার্থক। পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Culture এর বঙ্গানুবাদ করেন সংস্কৃতি শব্দে। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈশিষ্ট্য কৃষি। সে কারণে কৃষি আর বাঙালি সংস্কৃতি একাকার হয়ে মিশে আছে।কৃষিকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতিকে কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে প্রতিটি সূর্য উদিত হয় কৃষির বার্তা দিয়ে। কৃষির ওপর ভিত্তি করেই মানুষ স্বপ্ন দেখে এক সমৃদ্ধ জীবনের।

একজন আদি নারী প্রথম ধরণীর বুকে বুনেছিল শস্যের বীজ। আগুন আবিষ্কারের পর সেটি ছিল অনন্য এক আবিষ্কার যা জন্ম দিয়েছিল আদি পেশা কৃষির। অযাচিতভাবে মায়ের বুকে দুধের ফোয়ারা দিয়ে স্রষ্টা নারীর উপর খাদ্য সংস্থানের প্রাথমিক ভার দিয়েছেন। পৃথিবীতে যা কিছু প্রাথমিক তার অধিকাংশ উপাদানই নারীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই প্রকাশ্যেই বা নিভৃতে সূচিত হচ্ছে নারীর অবদান। নারী কখনো নদী, কখনো প্রকৃতি, কখনো কোমলতার প্রতীক, কখনো সৌন্দর্যের। অগণিত নারীর সেবার পরশ বিশ্ব মানবতাকেই উজ্জীবিত করেছে। যে ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি উজ্জ্বল তা হচ্ছে কৃষি। পৃথিবীতে প্রথম শুধু শস্যের বীজ নয়, কৃষির বীজও রোপিত হয় নারীর হাত দিয়ে। সব প্রাণীরই জন্ম মায়ের মাধ্যমে। মা নিশ্চিত করে সন্তানেরখাদ্য। খাদ্য উপকরণের

উৎপাদন, খাদ্যসামগ্রীর প্রক্রিয়াজাতকরণ কিংবা স্নেহের পরশ দিয়ে খাদ্য খাওয়ানোর কাজটি মায়ের প্রাকৃতিক কাজ। সবখানেই নারী রচনা করেন সাফল্য ও যশ। অর্জনে, রক্ষায়, মানুষকে জাগানোর প্রশ্নে যুগে যুগে নারী থেকেছে অনন্য ভূমিকায়।

আমাদের বাংলাদেশে সামগ্রিক বিচারে কর্মশক্তির বড় অংশটিই দখল করে আছে নারীরা। মোট গ্রামীণ নারীর শতকরা ৭৭.৪ ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত। ILO'র হিসাব অনুযায়ী এদেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৪৩ ভাগ। কিন্তু এর বাইরেও বহু নারীর শ্রম রয়েছে যা শ্রমিকের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। সময়ের পরিমাপ ও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব অনেক বেশি।

কৃষিখাতের ২১টি কাজের ধাপের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ ১৭টি ধাপে। নারীরা কৃষিক্ষেত্রে চাষ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্তরে কাজ করে থাকেন। নারীরা এক্ষেত্রে যে সকল কাজ করে থাকে সেগুলো হচ্ছে বীজ সংরক্ষণ, বীজ বপন, চারা রোপন, আগাছা পরিষ্কার, ক্ষুদ্রাকৃতির সেচ কাজ, সার ছিটানো, কীটনাশক ছিটানো, পাম্প চালানো, ফসল বা ধান কাটা, ধান মাড়াই ও পরিষ্কার, ধান ভিজানো, ধান সিদ্ধ করা, শুকানো ও ঝাড়া এভাবেই নারীরা ধান থেকে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তুলেন। গ্রামীণ নারীদের একটা বড় অংশ বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। তাছাড়া গৃহসংলগ্ন বাগানে বিভিন্ন রকমের ফলফলাদি, মসলাদি ও ওষুধের গাছ-গাছড়া উৎপাদন করে থাকে। নারীরা মাছ ধরার জাল তৈরি থেকে শুরু করে মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের জন্য পুকুর তৈরি বা জলাশয় লিজ নেয়া, মাছের খাবার সংগ্রহ ও খাবার ছিটানো, শুটকি ও নোনা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। এর পাশাপাশি নারীরা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালনও করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম। কৃষিখাতে নিয়োজিত পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প হলো চিংড়ি শিল্প। এ শিল্পের ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোও নারীরা অধিক সংখ্যায় করে থাকেন। সামুদ্রিক মৎস্য শিল্প, অভ্যন্তরীণ মৎস্য শিল্পে, মৎস্য সংক্রান্ত সেবাখাতে অধিক সংখ্যক নারী নিয়োজিত রয়েছেন। মাছ চাষে জেলে পরিবারের নারীরা মাছ ধরার পর মাছ বাছাই/কাটা, বাছা, শুকানো ও বাজারজাতকরণের উপযোগী করার দায়িত্ব পালন করে এবং শুটকি তৈরিতে অবদান রাখছে। বর্তমানে মিঠাপানির মাছ চাষের ক্ষেত্রে নারীরা বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নারীরা জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে।

পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে বেবি চাকমা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার পরিবারের চাকা। যশোরের নওয়াপাড়ার হামিদা বেগম গোটা জেলায় এক দৃষ্টান্ত। সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জের রহিমা বেগম কাঁকড়া চাষ করে শুধু নিজের পরিবারের স্বচ্ছলতাই নয়, আলোকিত করেছেন গোটা এলাকাকে। যশোরের গদখালির বারিছন তো সবারই চেনা। ফুল চাষ ও বাণিজ্যে তিনি এক পথিকৃৎ। এমন হাজার হাজার উদাহরণ এখন বাংলাদেশে। যারা নিজের তাগিদেই ঘর থেকে বেরিয়েছে। নিজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করছে, মানুষের মাঝে গড়ে তুলেছে এক দৃষ্টান্ত। নারীরা এভাবেই কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

কৃষি উৎপাদনের আদি মাতা নারী হলেও এর ক্রমবিকাশে সে একাকিনী থাকেনি। পুরুষ তার সাথে সাথে পদে পদে সহায়তা করেছে। নারী-পুরুষের মিলিত চেষ্টাতে এখন কৃষির উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে। তারই প্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় লিখেছেন–

শস্যক্ষেত্র উর্বর হল, পুরুষ চালাল হাল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হাল, নারী বহে জল,
সেই জলমাটি মিশে ফসল হইয়া
ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

নারী যেসব কৃষির অগ্রদূত, পুরুষও তেমনি আমাদের কৃষি সমাজ সংসারকে মহিমান্বিত করেছে জীবনের সবটুকু বিনিয়োগ দিয়ে। তারাই আমাদের বাংলাদেশ নামের এই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। তারাই আমাদেরকে সম্ভাবনার পথ দেখায়, আমাদের স্বপ্ন রচনা করে। কৃষি তাদের নাড়িতে গাঁথা, তাদের অস্তিত্বের প্রধান স্পন্দন। ১৯৭১ এ সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের যে জমিতে চাষাবাদ করে ৭ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ হতো আজ স্বাধীনতার চার দশক পার করে এসে দেড় কোটি কৃষক পরিবার তার চেয়েও অনেক কম জমিতে চাষ করে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মুখে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে, মানুষের জীবনমান উন্নয়নে রাতদিন পরিশ্রম করছেন। কৃষির উন্নয়নে, স্বল্প জমিতে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনে তারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। টেকসই প্রযুক্তি নিজেরা উদ্ভাবন করে ব্যবহার করছেন, পরিবেশ সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন করে নিজেরা টিকে আছেন। দেশে মানুষ যে হারে বেড়েছে কৃষিজমি বাড়েইনি বরং কমেছে। সেখানে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে, এর পুরো অবদান কৃষকদের নিজেদের।

অধিক ফসল ফলাবার জন্য তারা লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। চাষাবাদ পদ্ধতি, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বীজ ব্যবহার, ফসল উৎপাদনের ঘনত্ব বাড়ানো, ট্রাক্টর ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন,

ফসল কাটার যন্ত্র, মাড়াই যন্ত্র,ধান সিদ্ধ করা, ধান শুকানো থেকে সর্বত্র আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন। বালাইনাশে কীটনাশক ব্যবহার করছেন। এখন সারা বছর ফলানো যায় এমন ফলমূল, শাকসবজি তারা চাষাবাদ করছেন। কৃষিতে যে পরিবর্তন এসেছে তার পুরো কৃতিত্ব তাদের।

সমন্বিত কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে দারুণভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কৃষকদের ভূমিকাই সর্বাগ্রে। কারণ বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কৃষকের সাফল্যকে প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্য নিয়ে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ঘোষণা করা হয়। অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমানের তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। যেখানে কৃষি এবং কৃষকের রয়েছে একটি বড় ভূমিকা।

বহু ছিদ্র রয়েছে কৃষি ইস্যুতে। যার বিবরণ সত্যিই ব্যাপক ও বিশাল। এত অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার ভেতরেই একমাত্র আশার মশাল জ্বালে কৃষকরাই। আশার আলো দেখায় আমাদের। আমাদের প্রাণভরে গর্ব করার অনেক ক্ষেত্রই আছে। সহায় সম্বলহীন এক প্রান্তিক কৃষক ঝিনাইদহের সাধুহাটি ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের হরিপদ কাপালীর হাত দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধানের এক জাত, ইতোমধ্যেই যা পরিচিতি পেয়েছে 'হরিধান' হিসেবে। এমন নিবেদিত নিষ্ঠাবান মানুষও আছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের কার্তিক প্রামাণিকের মতো। যিনি ১০ বছর বয়স থেকে মানুষকে শান্ত ছায়ায় আগলে রাখার জন্য বৃক্ষরোপন করে চলেছেন। আর সফল কৃষক তো অগণিত। যারা ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে নিজেদেরকে বহুদূর উপরে নিয়ে গেছেন। কৃষকরা শুধু নায়কই নয়, মহানায়কে পরিণত হচ্ছেন। পাবনা অঞ্চলে একেক কৃষি ফসল উৎপাদনে সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষকদের এমন পরিচিতি এসেছে কেউ গাজর জাহিদুল, কেউ পেঁপে বাদশা, কেউ পেঁয়াজ সিরাজ, কেউ ধনে ময়েজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এই অর্জন তো ব্যাপক, বিশাল।

১০-১৫ বছরের মধ্যে দেশের ৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকার উপলক্ষ হয়ে উঠেছে পোলট্রি শিল্প। নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে দেশীয় পোলট্রি আজ গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। এখন এদেশেই পোলট্রি প্রসেসিং হচ্ছে, উৎপাদিত হচ্ছে চিকেন নাগেট। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অটোমেটিক পোলট্রি খামারও গড়ে উঠেছে। সেখানে উৎপাদিত ডিম আধুনিক প্যাকেটে বাজারজাত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে সিমেন্স ক্রায়োপ্রিজারভেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আধুনিক জাতের গবাদিপশু উৎপাদন করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে কৃষক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার প্রশ্নে কৃষকেরা সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

শুধু আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের প্রেক্ষাপট নয়। বস্ত্র, আশ্রয়, কর্মসংস্থান, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য কৃষকের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে কৃষকের সফলতা ও বিফলতার ওপর। আবার জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ বা অবক্ষয় নির্ভর করে কৃষকের ওপর। সঙ্গত কারণেই কৃষকরা আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের মূল ইস্যু। দেশের কৃষকরা বছরে পৌনে ৩ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে প্রায় ১৭ কোটি জনগণের মুখের খাদ্য

বৃহৎ খাত	খাত/উপখাত	প্রবৃদ্ধির হার (%)		অবদানের হার (%)	
		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯ (সাময়িক)	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯ (সাময়িক)
কৃষি	১. কৃষি ও বনজ	৩.৪৮	২.৫৮	১০.৬৭	১০.১১
	ক. শস্য ও শাকসবজি	৩.০৬	১.৭৫	৭.৫১	৭.০৫
	খ. প্রাণিসম্পদ	৩.৪০	৩.৪৭	১.৫৩	১.৪৭
	গ. বনজসম্পদ	৫.৫১	৫.৫৮	১.৬২	১.৫৮
	২. মৎস্যসম্পদ	৬.৩৭	৬.২৯	৩.৫৬	৩.৫০

নিশ্চিত করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাত্র ১৫ লাখ টন খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে দেশ যেখানে হিমশিম খায়, সেখানে যদি চাহিদার অর্ধেক খাদ্যশস্যও আমদানি করতে হতো, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? বর্তমানে জাতীয়জিডিপিতে কৃষিখাতের মোট অবদান শকতরা ১৪ ভাগ এবং শস্যের শেয়ার শতকরা ০৮ ভাগ। বাংলাদেশে ৯০-এর দশকের পর থেকে ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি পূর্বের তুলনায় বেশি।

মূল্য সংযোজনের গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষকের অবদান ব্যাপক। দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকরা নারী, পুরুষ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষিখাতকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে গ্রামীণ নারী-পুরুষ সমান তালে ভূমিকা পালন করছে। নারী কৃষকরা তাদের পরিবারের খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি বাণিজ্যিক কৃষিকাজে অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকেচাঙা রাখছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কৃষি অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় নারী অগ্রবর্তী ভূমিকায় থাকলেও তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আজও জোটেনি, হয়নি কৃষিকাজে নারীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন। বর্তমানে দেশে কতজন নারী কৃষক কৃষিকাজে যুক্ত আছে এ সংখ্যা সরকারি হালনাগাদে আজও উঠে আসেনি বলে জানানো হয় গবেষণাপত্রে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান এখনও দৃশ্যমান নয়।

১৯৯৮ সালে কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল 'অন্ন যোগায় নারী' এ স্লোগানটি। বর্তমানে কৃষিতে নারীর অধিকতর সম্পৃক্ততার উপযোগী ও প্রতিবন্ধকতা পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে কৃষিকাজে নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিকল্পনায় নীতিমালা ও কৃষিনীতি প্রণয়ন করে (১৯৯৯)। কৃষি কর্মকান্ডে গ্রামীণ নারীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণই নারীর প্রধান সম্ভাবনা। সরকারি-বেসরকারি ও প্রাইভেট সংস্থার সহায়তায় কৃষি উন্নয়নে নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সর্বোপরি, নারী ও পুরুষ কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের নিম্নলিখিত বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে:

১. ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার করে কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করতে হবে।
২. প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কৃষকদের কম দামে সার ও কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে।
৩. কৃষকরা যাতে স্বল্পমূল্যে সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি পায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. প্রতিটি কৃষকের জন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ নিশ্চিত করতে হবে।
৬. স্বল্প সুদে কিংবা বিনা সুদে প্রয়োজনের সময় কৃষকদের কৃষিঋণ দিতে হবে।
৭. পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। এই দেশের আলোতে আমরা চোখ মেলি, বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, পানিতেজীবন বাঁচাই, মাটিতে আশ্রয় পাই। এককথায় এদেশের সবকিছুর সাথেই রয়েছে আমাদের নাড়ির যোগ আর মনের মিতালি। এদেশের শতকরা ৮০% মানুষ কৃষিকাজ করে। মাথা ছাড়া যেমন মানবদেহের কথা ভাবা যায় না, তেমনি কৃষির উন্নতি ছাড়াও আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভাবা যায়না। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই আমাদের অর্থনীতির মরা গাঙে জোয়ার আসবে। তখন সোনার বাংলা ভরে উঠবে ধনে-ধান্যে, পুষ্প-পল্লবে। তাই কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য প্রথমে কৃষকদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। এ প্রেক্ষিতেই ড. আতিউর রহমান বলেন 'Our main focus should be, to develop the poor condition of the peasantry which could help us to reach the highest pinnacle of success.'

তথ্যসূত্র:

১. আবদার মুনিম, কৃষি ও কৃষক, পৃষ্ঠা ১-৬
২. ড. মো. আবুল কাসেম, বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ৪৫
৩. সমকালীন কৃষি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, শাইখ সিরাজ, পৃষ্ঠা ১২৪, ১২৫
৪. কৃষিখাতে রূপান্তর, জাহাঙ্গীর আলম
৫. মাটি ও মানুষের চাষবাস, শাইখ সিরাজ
৬. শাইখ সিরাজ, বাংলাদেশ ও আমাদের কৃষি, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৯
৭. শাইখ সিরাজ, কৃষি ও গণমাধ্যম
৮. https://cvoice24.com>news>n= কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখছে দেশের নারীরা-Cvoice24.com
৯. নারী ও রাজনীতি, প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, কৃষিতে নারী, পৃষ্ঠা ৩০৯

কাঞ্চনজঙ্ঘা: দেশের সীমানা পেরিয়ে আসা এক অপরূপার গল্প

কাঞ্চনজঙ্ঘা। হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত ভয়ংকর সুন্দর এক পর্বতশৃঙ্গের নাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮৫৮৬ মিটার। উচ্চতার দিক দিয়ে এটি পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। তবে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত মনে করা হতো, কাঞ্চনজঙ্ঘাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এই শুভ্র অপরূপা আবার একইসাথে পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম এবং ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গও। সুন্দরের সাথে ভয় না মিশলে নাকি নান্দনিক আবহ তৈরি হয় না। সে হিসেবে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নান্দনিকতার বিশেষ মাত্রা বলা যেতে পারে। এত বেশি দুর্গম আর প্রতিকূল এর যাত্রাপথ, যে এর চূড়ায় পৌঁছাতে প্রতি পাঁচজনের একজনকে ব্যর্থ হতে হয়। আক্ষরিক অর্থে যদিও এর চূড়ায় কেউ পা রাখতে পারেনি কোনোদিন। সে নিয়ে আছে আরেকটা গল্প।

নেপাল আর সিকিমের অনেক মানুষ এই পর্বতকে পূজা করে। তারা বিশ্বাস করে, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় পবিত্র আত্মারা থাকে; তাই এর চূড়ায় পা রাখলে এর পবিত্রতাকে অবমাননা করা হবে। তাই এই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে দেয়া হতো না কাউকে। পরে ১৯৫৫ সালে জো ব্রাউন ও জর্জ ব্যান্ড সিকিমের রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, তারা এর সর্বোচ্চ চূড়ায় পা রাখবেন না, শুধুমাত্র আরোহণ করবেন। এ শর্ত মেনেই তারা যাত্রা করেন। এটিই ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রথম মনুষ্য পদচারণা। সে থেকে এখন পর্যন্ত সকল অভিযাত্রী দল এই নিয়মটি মেনে এসেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে অনেকরকম মিথ প্রচলিত আছে। যেমন এর নিচে বাস করা লেপচা জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করে, এ পর্বতে ইয়েতি থাকে। এর চূড়ার বরফের মধ্যেই এই পৃথিবীর প্রথম নারী এবং প্রথম পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে, এমন বিশ্বাসও প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করে, অমরত্বের রহস্যও নাকি লুকানো আছে কাঞ্চনজঙ্ঘাতে।

শেরপা তেনজিংয়ের বই 'ম্যান অভ এভারেস্ট' অনুযায়ী, কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের অর্থ 'বরফের পঞ্চরত্ন'। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাঁচটি চূড়া থেকেই এই নামকরণ। পাঁচটি চূড়ার প্রতিটিরই উচ্চতা ৮,৪৫০ মিটারের উপরে। দুটি চূড়ার অবস্থান নেপালে এবং বাকি তিনটির অবস্থান ভারতের উত্তর সিকিম ও নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকায়। দৃষ্টিনন্দন এই পাহাড়ের অপার্থিব সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সাদা বরফে আচ্ছাদিত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় প্রথম সূর্যের আলো পড়ার সাথে সাথেই এক অপূর্ব মাদকতার সৃষ্টি হয়। সূর্যের আলোর ক্রমাগত আলিঙ্গনে কালচে, লাল, সোনালি, কমলা, হলুদ এবং সাদা বর্ণ ধারণ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সৌন্দর্যের এই বৈচিত্র্যকে নিংড়ে নিতে চাইলে তাই সারা দিনই তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘার এ সৌন্দর্য উপভোগের জন্য কেউ ছুটে যান সিকিমে, কেউ কালিম্পং, আবার কেউ কেউ ছুটে যান দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়ার দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। ২,৫৭৩ মিটার উঁচু টাইগার হিল থেকে এর সৌন্দর্য অবলোকন করতে যান অজস্র দর্শনার্থী, বিশেষ করে বাঙালিরা। কারণ, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির অনেক উপাদান আছে এসব জায়গায়। বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো দেখতে পাওয়া যায় অক্টোবর মাসে। সূর্য একটু দক্ষিণে হেলে থাকার কারণে বেশি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় এ সময়ে। যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সৌন্দর্য পূজারীদেরকে পুরো মাত্রায় হতাশ হতে হবে। তবে সুন্দরের স্পর্শ পেতে এটুকু কষ্ট সহ্য করাই যায়, ঠিক যেমন গোলাপের সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে কাঁটার সম্মুখীন হতে হয়।

মনোরম এই সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ থেকেও। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মেঘমুক্ত আকাশে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের যেকোনো খোলা জায়গা থেকেই এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে টুকটাক দেখা গেলেও এই সময়টাতে সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা থেকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে তেঁতুলিয়া শহরের দূরত্ব মাত্র ১৩৭ কিমি.। মহানন্দা নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা তেঁতুলিয়া শহর। কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যের টানেই প্রতি বছরই তেঁতুলিয়ার ঐতিহাসিক ডাকবাংলোয় ছুটে আসছেন অসংখ্য মানুষ। হেমন্তের পাকা ধানের রং, শীতের আগমনী গান, তেঁতুলিয়ার সমতল ভূমির চা বাগান আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য; সবমিলিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরছেন দর্শনার্থীরা। তেঁতুলিয়া শহরে রয়েছে অজস্র চা বাগান। বাংলাদেশে সমতল ভূমিতে চা চাষ হয় একমাত্র এই পঞ্চগড় জেলাতেই।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে পঞ্চগড় শহরে যেতে যেতেই চোখে পড়বে কাঞ্চনজঙ্ঘা। করতোয়া ব্রিজ থেকে সকালের সূর্যের আলোয় লালিমাযুক্ত সৌন্দর্য দেখলেই মন ভরে যাবে। পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা হাইওয়ে ধরে সেই অপরূপাকে তাড়া করতে করতে চলে যেতে পারেন বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত। এর মধ্যে অনেকবারই তার রংবদল দেখতে পারবেন। প্রশাসনের অনুমতি যোগাড় করলে পারলে থাকতে পারবেন মহানন্দার তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক তেঁতুলিয়া ডাকবাংলোয়। এছাড়াও তেঁতুলিয়া শহরে থাকার জন্য ৫০০ টাকার মধ্যে আবাসিক হোটেলে সিঙ্গেল রুম পেয়ে যাবেন। আবার চাইলে পঞ্চগড় শহরেও বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে থাকতে পারবেন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে পঞ্চগড় শহর থেকে বাসে চড়ে দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছাতে পারবেন তেঁতুলিয়া শহরে। সারাদিনই বাস পাওয়া যায়। বাসে জানালার পাশের সিটে বসবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতেই পৌঁছে যাবেন তেঁতুলিয়ায়।

তেঁতুলিয়া শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। সময় থাকলে ঘুরে আসবেন শালবাহানের দিকে। ডাকবাংলো, চা বাগান আর সীমান্তের মনোমুগ্ধকর কিছু জায়গায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে পারেন। তেঁতুলিয়া শহরে বাংলা খাবারের বেশ কিছু ভালো হোটেল আছে। খাবার-দাবারে কোনো অসুবিধা হবে না। চা বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কোনো একটা নদীর পাড়ে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকলে কিছুক্ষন পরপর দেখবেন, আপনার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অজস্র পাখি, যাদের সচরাচর দেখা যায় না। অনেক অচেনা পাখির সাথে পরিচয় হয়ে যাবে এভাবেই। এ পাখিদের কাউকেই ওই কাঁটাতার বা সীমান্ত দিয়ে আটকে রাখা যায়নি, যেমন আটকে রাখা যায়নি কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যকে।

বিকাল পেরিয়ে যখন গোধূলীর আলো নামবে, তখন সীমান্তবর্তী একটা টং দোকানে যেয়ে এক কাপ চা খেতে পারেন। আপনার পাশে বসে যে লোকটা চা খাচ্ছেন, হতে পারে তিনি একজন পাথরশ্রমিক। তার সাথে একটু গল্প করবেন। রুমে ফেরার সময় শিশিরের ঘ্রাণ নেবেন। সন্ধ্যায় কুয়াশার চাদর আপনার সঙ্গী হবে। উত্তরের শীতের আলতো স্পর্শ পেয়ে যাবেন এভাবেই। এছাড়াও আপনাকে সঙ্গ দেবে সীমান্তের সোডিয়াম আলো। মহানন্দাসহ আরো বেশ কয়েকটি নদীর অদ্ভুত ছুটে চলা আপনাকে বিস্মিত করবে। নো ম্যানস ল্যান্ডে বেঁচে থাকা কিছু অসহায় জঙ্গল আর সেইসব জঙ্গলকে শাসন করে বেঁচে থাকা কিছু পাখিকে দেখতে পাবেন। পাহাড়ের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির ডাকের সঙ্গে কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে এক বুক তৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরতে পারবেন।

■ আরিফ রাইহান শুভ
roar.media, ২০ নভেম্বর ২০২০

করোনাকালে বিশ্ব প্রবীণ দিবস

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সব অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণিকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

বিশ্বব্যাপী প্রবহমান মহামারি করোনা যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অশনিসংকেত–এ কথা তাবৎ তথ্য পরিসংখ্যানে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আসন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কালে মানুষ আর মেশিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের, অস্তিত্বের ও টেকসই অবস্থানের যে ঠান্ডা লড়াই চলবে, সেখানে প্রবীণ নয়, নবীনদের প্রযুক্তি জ্ঞান হবে অন্যতম নিয়ামক। করোনার কর্মপরিকল্পনার রেখচিত্র ও উদ্দেশ্য-বিধেয় বুঝতে বাকি থাকছে না কারো।

বার্ধক্য হলো জীবনচক্রের শেষ ধাপ। জীবনের নাজুক ও স্পর্শকাতর অবস্থা! বেঁচে থাকলে প্রত্যেক মানুষকে বার্ধক্যের সম্মুখীন হতেই হবে। বার্ধক্য মানে শারীরিক অবস্থার অবনতি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়লেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও হজমশক্তি লোপ পায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে না। রক্তচাপ ও হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। দুর্বল স্বাস্থ্য আর উপার্জনহীন একজন প্রবীণ সবার কাছে অবহেলিত, উপেক্ষা ও দুর্ব্যবহারের শিকার। তাঁদের ভরণ-পোষণ, সেবা-যত্ন, চিকিৎসা ও আবাসন সমস্যা দেখা দেয়। প্রবীণদের অনেকে বুঝতে চান না। তাঁদের কল্যাণে কাজ করতেও চান না। হতাশা, বিষণ্নতা ও নিঃসঙ্গতায় চলে প্রবীণদের জীবন। প্রবীণ সেবাসূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৭তম।

প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত (৪৫/১০৬) জাতিসংঘের। এবারে এ দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় 'টুওয়ার্ডস এ সোসাইটি ফর অল এজেস', 'সমাজ হবে সব বয়েসি সকলের'। এই প্রতিপাদ্য বা স্লোগান এর আগে ১৯৯৮ সালেও উচ্চারিত হয়েছিল। ২২ বছরের ব্যবধানে একই স্লোগান পুনঃ উচ্চারণের দ্বারা বয়স-নির্বিশেষে সবার জন্য নির্মিত সমাজে প্রবীণদের সুরক্ষা ও তাঁদের অধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত যে ২০০২ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ১৫৯টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রবীণ বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা ও রাজনৈতিক ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 'সব বয়সীর জন্য উপযুক্ত একটি

আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ
ফিরে দেখা ২০২০

২০২০ সাল; বছর ধরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে হিমশিম খেয়েছে বিশ্ব। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন একমাত্র কার্যকর টিকাই পারে এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে। তবে টিকা তৈরিতে অনেক বছর সময় লেগে যায়–তাই খুব দ্রুত কিছু পাওয়ার আশা যেন মানুষ না করে।

মহামারীতে কাবু বিশ্ব

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশে প্রথম করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ে। নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ব্যাখ্যা করা হলেও ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় 'কভিড-১৯' যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হচ্ছিল। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ১১ মার্চ ২০২০ কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করে। শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুস আক্রমণকারী এই ভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কেড়ে নিয়েছে বহু জীবন, বহু মানুষ দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতার শিকার হয়ে এখনো এই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

বছর শেষে ভ্যাকসিনে আশার আলো

২০২০ সাল; বছর ধরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে হিমশিম খেয়েছে বিশ্ব। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন একমাত্র কার্যকর টিকাই পারে এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে। তবে টিকা তৈরিতে অনেক বছর সময় লেগে যায়–তাই খুব দ্রুত কিছু পাওয়ার আশা যেন মানুষ না করে। কিন্তু নভেম্বরের ৯ তারিখে আমেরিকান কোম্পানি ফাইজার ও জার্মানির বায়োএনটেক যৌথভাবে টিকা উদ্ভাবনে তাদের সাফল্য ঘোষণা করে জানায় তাদের টিকা করোনার আক্রমণ ঠেকাতে ৯০

শতাংশের বেশি কার্যকর। এ ছাড়া রাশিয়া গত আগস্টে স্পুটনিক-৫ টিকার অনুমোদন দেয়। যা ৯২% নিরাপদ। তবে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনের টিকার দিকে তাকিয়ে বিশ্ববাসী। এই টিকাটি খুব শিগগিরই অনুমোদিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

লকডাউনে ঘরবন্দি মানুষের অন্যজীবন

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকে বিশ্ব মহামারি ঘোষণার পর লকডাউনের কবলে পড়ে পুরো বিশ্ব। যেসব এলাকা মহামারী আক্রান্ত হয়, সাধারণত সে এলাকায় প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়ার নাম লকডাউন। করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউন ও বিধিনিষেধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ লকডাউনে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। জুন-জুলাই মাসে করোনার প্রথম ঢেউ কমে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বরে শুরু হয় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, এরপর করোনার সংক্রমণ রোধ ও মৃত্যুহার কমাতে বিশ্ববাসী ফের লকডাউনে যেতে শুরু করে।

ওয়ার্ক ফ্রম হোম

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউন ও বিধিনিষেধের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল বিশ্বের অর্থনীতি। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একের পর এক সরকারি, বেসরকারি অফিস, বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ একাধিক মল, সিনেমা হল, বাজারসহ একাধিক প্রাইভেট সেক্টর। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করেই কাজ সারছেন বহু মানুষ। অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্স এবং ভিডিও চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে করোনা সংকটের আবহের মধ্যেই অনেকে সেরে নেন অফিসের কাজ। পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি।

ট্রাম্পের পরাজয়, বাইডেন-কমলার ইতিহাস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় সব রাজনৈতিক হিসাব পাল্টে দিয়েছে। ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেও এখনো পরাজয় মেনে নিতে রাজি নন ট্রাম্প। এবার মার্কিন নির্বাচনে আগাম ভোটের রেকর্ড, ব্যালটের মাধ্যমে পাঠানো ভোট নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল– সেটিও বিরল। নির্বাচনের পরাজয়ের পর ভোট পুনঃগণনা ও কারচুপির অভিযোগ করেছিলেন ট্রাম্প শিবির। তবে আদালত তা খারিজ করে দেয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী কমলা হ্যারিস। এই জয়ে তিনি লিখছেন নতুন ইতিহাস।

ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার আন্দোলন

আমেরিকার মিনিয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজতে এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর জের ধরে ২০২০ সালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন। জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। করোনা আতঙ্ক উপেক্ষা করে মানুষ প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভে পথে নামে। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে জারি করা হয় কারফিউ। আমেরিকায় বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর নানা প্রান্তে পৌঁছে এই প্রতিবাদের ঢেউ। জন্ম নেয় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন–'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'।

বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

'মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস' হিসেবে খ্যাত লেবাননের রাজধানী বৈরুতে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৪ আগস্ট ২০২০। রাসায়নিক পদার্থের এক গুদামে বিস্ফোরণটি ছিল এ শতাব্দীর ভয়াবহতম 'অ-পারমাণবিক' বিস্ফোরণ। পুরো ব্যাপারটা ঘটে মাত্র চার সেকেন্ডের মধ্যে। এ বিস্ফোরণে রাজধানী ও আশপাশের এলাকা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে অন্তত দুই শতাধিকের বেশি মানুষ নিহত এবং ছয় হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েছিল অন্তত তিন লাখ মানুষ। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব গিয়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে। শহরটির ৫ হাজার বছরের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি আর কখনো তৈরি হয়নি।

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা, বেকারত্ব, তেলের দরপতন

করোনা মহামারীতে প্রবল ধাক্কা খেয়েছে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি। বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধি মাইনাস ৪.৪ শতাংশে চলছে। এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা কতদিন সম্ভব হবে তা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এত বড় ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে উন্নত, ধনী দেশগুলোও। উৎপাদন কমে গেছে, দীর্ঘ লকডাউনে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মী ছাটাই হয়েছে ছোট-বড় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের সংখ্যা ছিল উদ্বেগজনক। পুরো বছরজুড়েই তেলের দরপতন বলে দেয় দেশে দেশে অর্থনৈতিক গভীর সংকট তৈরি হয়েছে।

জ্বলেছে পৃথিবীর ফুসফুস

জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত আমাজনের ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার পুড়ে ছাই হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার দাবানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে অস্ট্রেলিয়া। এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ১৮ জন মানুষ। এ ছাড়াও নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়াজুড়ে ১ হাজার ২০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

জেনারেলকে হত্যা ♦ উড়ল ইরানের লাল পতাকা ♦ ইরানের মিসাইলে ধ্বংস মার্কিন ঘাঁটি

ইরাকে মার্কিন দূতাবাসে হামলার পর এ বছরের শুরুতেই মার্কিন রকেট হামলায় মারা যান ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ও মাহদি আল মুহানদিস। বাগদাদে বিমানবন্দরের বাইরে এলিট ফোর্সের জেনারেলকে হত্যার কথা স্বীকার করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই ইরান প্রতিশোধে অঙ্গীকার ঘোষণা করে। কম প্রদেশে পবিত্র মসজিদের চূড়ায় উড়ানো হয় লাল পতাকা। সরাসরি যুদ্ধের নিশানা পুরো বিশ্বকে নাড়া দেয়। ইরান প্রতিশোধের কঠিন হামলা শুরু করে ইরাক ও পার্শ্ববর্তী সীমান্ত বরাবর যেখানে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটি, বিমানবন্দর ছিল। ইরানের মিসাইল হামলায় বেশ কয়েকটি মার্কিন ঘাঁটি ধুলায় মিশে যায়। বহু মার্কিন সেনা আহত হন। গত কয়েক দশকে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে এমন সামরিক হামলা ছিল বিরল। রাজনৈতিক

ও সামরিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এই সংকট পুরো বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ইরান তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে ঘোষণার পর দুই দেশের সামরিক হামলা থ্রাস পায়।

ইসরায়েল সম্পর্কে নতুন মোড়

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৩ আগস্ট ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যান এই ঘোষণাকে ব্যাখ্যা করেন 'মধ্যপ্রাচ্যের একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প'। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। এর এক মাস পরই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা দেয় বাহরাইনও। এর আগে মিসর ১৯৭৯ সালে এবং জর্ডান ১৯৯৪ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইসরায়েলের জন্য এই দুটি আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানো ছিল সত্যিকার অর্থেই এক বিরাট অর্জন। তবে, গত অর্ধ শতাব্দী ধরে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ঘুচিয়ে স্বাধীন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রতি পুরো আরব বিশ্বের যে ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ছিল, এই ঘোষণা আসে তার প্রতি একটা বড় আঘাত হিসেবে।

ব্রেক্সিট কার্যকর ব্রিটেনের

৩১ জানুয়ারি অবশেষে কার্যকর হয় ব্রেক্সিট। ৪৭ বছরের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ে যুক্তরাজ্য। এই দিনটি ব্রিটেনের 'নতুন যুগের উদয়' বলে স্বাগত জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ২০১৬ সালের গণভোটের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর কার্যকর হয় ব্রেক্সিট। এ সময় একদিকে যেমন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয় তেমনি বিক্ষোভও করেছে ব্রেক্সিট বিরোধীরা। ২৪ জানুয়ারি ব্রেক্সিট বিলে স্বাক্ষর করেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তারপর ২৯ জানুয়ারি স্থানীয় সময় বিকালে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক ভোটে অনুমোদন পায় ব্রেক্সিট চুক্তি।

ফুটবল কিংবদন্তি ম্যারাডোনার বিদায়

আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর ম্যারাডোনা এ বছরই চির বিদায় নিলেন। বিশ্বজুড়ে শত কোটি ভক্ত তার প্রয়াণে চোখের জল ফেলেছে। ম্যারাডোনাকে অনেকেই বলেন ফুটবলের ঈশ্বর। তার খেলায় যে দক্ষতার প্রদর্শনী, গতি, চমৎকারিত্ব, আর খেলায় কখন কি ঘটতে পারে তা আগে থেকে বুঝে ফেলার ক্ষমতা ছিল–তা ফুটবল ভক্তদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

নোবেল জয়ী ২০২০

চলতি বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল বিজয়ী হার্ভে জে অলটার, চার্লস এম রাইস এবং মাইকেল হোওটন। সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন কবি লুইস গ্লুক। অর্থনীতিতে দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল মিলগ্রোম ও রবার্ট উইলসন। রসায়নে নোবেল পেয়েছেন দুই নারী গবেষক শারপান্টিয়ের এবং ডাউডনা। পদার্থ বিজ্ঞানে রজার পেনরোস, রাইনহার্ড গেনজেল এবং আন্দ্রেয়া ঘেজ। শান্তিতে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)।

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট

৩০ জুন ২০২০ জাতিসংঘ তহবিল (UNFPA) বৈশ্বিক জনসংখ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ব জনসংখ্যা (২০২০) ৭৭৯.৫০ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১৫-২০২০) ১.১%। গড় আয়ু ৭৩ বছর। নারী প্রতি প্রজনন হার ২.৪ জন। সর্বাধিক নারী প্রতি প্রজনন হারের দেশ নাইজার; ৬.৭ জন। সর্বাধিক জন্মহারের দেশ বাহরাইন; ৪.৩%। সর্বনিম্ন জন্মহারের দেশ লিথুয়ানিয়া ১.৫%। জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ চীন। জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

মহাকাশে মানুষ পাঠাল স্পেসএক্স

মহাকাশযাত্রায় ইতিহাস গড়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন নির্মাতা কোম্পানি স্পেসএক্স। যুক্তরাষ্ট্রের এই বাণিজ্যিক কোম্পানির তৈরি রকেটে চড়ে মহাকাশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের যাত্রা করেছেন নাসার দুই মহাকাশচারী। তারা হলেন দুই নভোচারী ডগ হার্লি এবং বব বেনকেন। কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মহাকাশযানে নভোচারী পাঠানোর ঘটনা এটাই প্রথম।

চাঁদের মাটি নিয়ে এলো চীন

১৬ ডিসেম্বর চাঁদের পাথর-মাটি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে চীনের রকেট চ্যাঙই-৫। এর ফলে ৪৪ বছর পর আবার চাঁদের মাটি ও পাথর এলো। পরিকল্পনামাফিক ভাবেই পৃথিবীতে অবতরণ করেছে ক্যাপসুলটি। গত নভেম্বরের শেষের দিকে ৮.২ টন ওজনের চীনা রকেট চ্যাঙই-৫ চাঁদের উদ্দেশে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই ল্যান্ডারটি চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে পাথর আর মাটির নমুনা সংগ্রহ করে। চাঁদ থেকে নিয়ে আসে দুই কিলোগ্রাম পাথর ও মাটি।

বেজেছে যুদ্ধের দামামা

নাগারনো-কারাবাখ: পূর্ব ইউরোপে দক্ষিণ ককেশাসের বিরোধপূর্ণ এলাকাটিকে কেন্দ্র করে ২৭ সেপ্টেম্বর আবার যুদ্ধ শুরু হয় আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে। আন্তর্জাতিকভাবে এলাকাটি আজারবাইজানের অংশ হলেও, আর্মেনিয়ার সরকারের সমর্থনে জাতিগত আর্মেনীয়রা এটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় নভেম্বরে শান্তি চুক্তি হলেও তা কার্যকর হয়নি। ছয় সপ্তাহের বেশি চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

ইথিওপিয়া : নভেম্বরের শুরুতে দেশটির সরকারি বাহিনীর সঙ্গে উত্তরে তাইগ্রের ক্ষমতাসীন দল তাইগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট (টিপিএলএফ)-এর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ তাইগ্রের কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেনা ঘাঁটিতে হামলার জবাবে বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশটির ফেডারেল বাহিনীর অভিযান শুরু করে। টিপিএলএফ-এর নেতাদের সঙ্গে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর তিক্ত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক সংঘর্ষে শত শত মানুষ মারা গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ ঘর ছাড়েন।

লিবিয়া : লিবিয়ায় জাতিসংঘের সমর্থনপুষ্ট সরকার, বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খলিফা হাফতারের বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে লড়ছে। লিবিয়ার যুদ্ধেও প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ, বাস্তুহারা হয়েছে কয়েক লাখ।

■ bd-pratidin, ৩০ ডিসেম্বর ২০২০

বিটোফেন : যিনি পশ্চিমি ক্লাসিকাল মিউজিকের ধারা বদলে দেন

বিশ্বখ্যাত মিউজিশিয়ান লুডহিক ভান বিটোফেন তার সৃষ্টির মাধ্যমে পশ্চিমি ক্লাসিকাল মিউজিকের ধারা বদলে দেন। জার্মানির বন শহরে জন্ম নেয়া বিটোফেন ১৭৭০ সালের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে ১৭ ডিসেম্বর ১৭৭০ খ্রিস্টান ধর্মীয় কায়দায় ব্যাপটাইজড করা হয়। তার জন্ম এর এক বা দুদিন আগে। পৃথিবী জুড়ে ১৭ ডিসেম্বর বিটোফেনের ২৫০তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই বাবার কঠোর শাসনে তিনি বেড়ে ওঠেন। বাবা চেয়েছেন বিটোফেন যেন বড় মিউজিশিয়ান হিসেবে গড়ে ওঠেন। তিনি তাকে সে সময়ের বিখ্যাত মোজার্ট বা হাইডেনের মতো সুরস্রষ্টা বানাতে চেয়েছেন।

বিটোফেনের জীবন অনেক উত্থান পতনে ভরা। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই সুরস্রষ্টা তার সৃষ্টি করা সেরা সুরগুলোর অধিকাংশই নিজে শুনতে পাননি! কারণ ২৮ বছর বয়স থেকে তার কানে শোনার ক্ষমতা কমতে থাকে। ৪৭ বছর বয়সে পুরোপুরি বধির হয়ে যান। তার জীবনে হতাশা এমন পর্যায়ে আসে যে তিনি আত্মহত্যা করার চিন্তাও করেছিলেন। একজন মানুষ কতোটা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে পুরো বিশ্ব মিউজিককে বদলে দিতে পারেন বিটোফেন তার অনন্য উদাহরণ।

১৮০০ সালে তিনি তার প্রথম সিম্ফোনি তৈরি করেন। বিটোফেন ব্যাপকভাবে আলোচিত হন তার তৃতীয় বা থার্ড সিম্ফোনির জন্য। এই মহান সুরস্রষ্টা এই সিম্ফোনিটি শুরুতে উৎসর্গ করেন ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সের শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে। বিটোফেন মনে করেছিলেন ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নেপোলিয়ন কাজ করবেন। কিন্তু ১৮০৪ সালের ১৮ মে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কনসাল থেকে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এতে খুবই দুঃখিত হন বিটোফেন। তিনি মনে করেন, নেপোলিয়ন প্রথাগত সম্রাটদের মতোই আচরণ করবেন। তাই নিজ হাতে তিনি তার সিম্ফোনি থেকে নেপোলিয়নের নাম কেটে দেন।

বিখ্যাত ফরাসি লেখক রোমা রোঁলা এতো বেশি বিটোফেন ভক্ত ছিলেন যে তার জীবন নিয়ে 'জাঁ ক্রিস্তোফ' উপন্যাস লেখেন। এর বাইরেও নয় খণ্ডে বিটোফেনের জীবনী লেখেন রোমা রোঁলা।

২৬ মার্চ ১৮২৭ সালে মৃত্যুবরণকারী বিটোফেন তার ৫৬ বছর বয়সের একটা বড় সময় কাটিয়েছেন সঙ্গীতের রাজধানী হিসেবে খ্যাত ভিয়েনা শহরে। তিনি তার কর্মময় জীবনে চারটি নৃত্যনাট্য, ১০টি সিম্ফোনি, ছয়টি ইনট্রো, একটি কনট্রা, ১২টি জার্মান নৃত্য সঙ্গীত, ১০টি কনসার্ট, ৩৯টি ঘরোয়া সঙ্গীত, ২৩টি পিয়ানো সঙ্গীত, সাতটি গীত এবং একটি কণ্ঠসঙ্গীত রচনা করেন।

বিটোফেনের সবচেয়ে আলোচিত সৃষ্টি নাইনথ সিম্ফোনি। এই মিউজিকটি তিনি নিজে শুনতে পারেননি। এটি এতো বেশি জনপ্রিয় হয় যে এর একটি অংশ 'ওডে টু জয়' ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের থিম মিউজিক বা সাংগঠনিক সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বিটোফেন প্রমাণ করেন একজন মানুষ যে কোনো বাধাই অতিক্রম করতে পারেন যদি তিনি তার লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। ২৫০তম জন্মদিনে এই মহান সুরস্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

॥ মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান

সূত্র : sarakhon.com, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০

অন্নের জোগান

মো. রাকিব হোসেন
সদস্য : ১২৬২/২০১৬

প্রভাতের সূর্য উদয়ের পূর্বেই জাগ্রত চাষির উদ্যত হাল;
পতিত জমির উর্বরতা আনয়নে তৎপর গোটা পরিবার।

সস্নেহে লালিত এক ঝাঁক স্বপ্ন বুকে নিয়ে
সম্মুখ যাত্রা চলে দৃঢ় মনোবলকে পুঁজি করে।
সযত্নে তৈরি ভূমির স্নিগ্ধ আঁচল মাঝে
সাদা-কালো, রঙিন কত না বীজ ছড়ানো খেতে।

শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে একাকার ধরায়–
অভুক্তের রাজ্যে বিলিয়ে আপন সত্তা,
শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত পুরো যৌবন,
পুত্রতুল্য সর্ব চারাগাছে পুত্রস্নেহ প্রদান!

দিন, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ, অর্ধবর্ষ পেরিয়ে–
ঘনিয়ে আসে সময় পরিপুষ্ট ফসল সংগ্রহে,
তীব্র শীত, ভারী বর্ষণ আর কাঠফাটা রোদের মাঠে,
ফসল সংগ্রহে এক অসম প্রতিযোগিতা নামে।

মৌসুমের পালাবদল লগ্নে ফসল তুললে ঘরে,
পরিবার পরিজনের মলিন বদন রঙিন হয়ে ওঠে।
সারা বছরের খরচাপাতির হিসেব কষে দেখে–
চাষার মুখে ফসলের হাসি-মুহূর্তেই ম্লান হয়ে পড়ে।

পুরোনো দেনার হালখাতার পত্র আসে ঘরে,
পাইকারের দরকষাকষির যাঁতাকলে পৃষ্ঠ চাষিরা–
ন্যায্যমূল্য কামনা অলীক কল্পনা হয়ে পড়ে,
লাভক্ষতির অংক মেলাতে চাষি দিশেহারা হয় শেষে!

দেনা-পাওনার অসম হিসেব শেষ হতে না হতেই
চলতি হাল ধরতে আবার নতুন মৌসুম আসে।
মূলধন নিমজ্জিত রেখে পুনঃচাষাবাদ চালিয়ে,
বছর শেষে নেমে আসে যেন উভয়সংকট ঘটে।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আহার জোটে এমন;
এক পোশাকে সারা বছর, খড়ের ঘরটাও হয় দুর্লভ!
তবুও আসে সন্তুষ্টি; পৌঁছায়ে অন্নের জোগান সর্বত্র,
অসাধ্য কাজও তুচ্ছ লাগে সবই দেশমাতৃকার জন্য।

তুমি পারবে

মাসকাওয়াথ আহসান প্যাভেল

নিজের হাতখানি নিজেই ধরো–
নিজেকে বলো, 'আমি পারব'।
পাথরে যে প্রাণ জাগায়–
মরুতে ফুল ফোটায় যে–
সেই স্রষ্টার সৃষ্টি তুমি।
আকাশের নেত্র-সাগরের গভীরে
সেই বৃহৎ-এর সাধনা–
তৃণের বুকে, বৃক্ষের প্রশাখায়–
তারই উদারতা ।
পতঙ্গের পাখায় আনন্দের স্পন্দন
পাখির গানে বেঁচে থাকার আনন্দ।
তোমার জীবনের আকাশে নক্ষত্র তুমি,
সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা,
ভোরের শুকতারা।
তাকে আশ্রয় করো–
আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হও তুমি।

ব্ল্যাক হোল নিয়ে গবেষণা করে SN 10 তালিকায় তনিমা তাসনিম অনন্যা

২০১৪ সাল থেকে সায়েন্স নিউজ বিশ্বের সেরা ১০ জন তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি তালিকা প্রকাশ করে আসছে, যা SN-10 নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ৪০ বছরের কম বয়সী বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কাজ তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে ২০২০ সালের তালিকা। যে তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের ২৯ বছর বয়সী তরুণ বিজ্ঞানী অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট তনিমা তাসনিম অনন্যা।

স্বপ্নের শুরু

১৯৯৭ সাল, বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এতটাও পরিচিত হয়ে উঠেনি। বিনোদন কিংবা সংবাদ; সাদাকালো পিকচার টিউবে BTV-ই প্রধান ভরসা। সচেতনরা অবশ্য পত্রিকাতেও চোখ রাখেন, রেডিওর ব্যবহার খুব একটা নেই।

কাজ সেরে একটু টিভির সামনে বসেছেন শামিমা আরা বেগম। টিভি খুলতেই দেখলেন এক বিস্ময়কর খবর। আমেরিকা নাকি প্যাথফাইন্ডার নামের এক রোবটিক মহাকাশযান পাটিয়েছে মঙ্গল গ্রহে। বিজ্ঞান পাড়ায় এ খবর হয়তো জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু সাধারণ এক গৃহিণীর কাছে এটি ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

কৌতূহলী শামিমা-আরা বেগম তার মেয়েকে শোনালেন প্যাথফাইন্ডারের গল্প। অবশ্য মেয়ে তনিমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। মায়ের উচ্ছ্বসিত চোখ-মুখ দেখে তনিমা সেদিন এতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর বাইরে আরো একটি জগৎ রয়েছে, আর সেখানে আছে পৃথিবীর মতোই আরও অনেক গ্রহ। তনিমার মনে শুরু হয় নানান জল্পনা-কল্পনা, সেই থেকেই ঠিক করেন বড় হয়ে পড়াশোনা করবেন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে।

২০০৮ সাল, তনিমা তখন কলেজ পড়ুয়া। শিশুকালের স্বপ্ন এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশে থেকে মহাকাশ নিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। এ সময় তার পরিবারকে তিনি পাশে পান। বাবা-মা তাকে আমেরিকার ভালো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তনিমা ছোটকাল থেকেই ছিলেন ভীষণ মেধাবী ফলে আমেরিকার উন্নত কলেজগুলোতে সহজেই আবেদন করতে পারেন। সুযোগ হয় পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের ব্রায়ান মাওর কলেজে।

সফলতা

২০১৩ সালে ব্রায়ান মাওর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক শেষ করেন। এরপর ভর্তি হন আমেরিকার নামকরা ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে। এখান থেকেই মাস্টার্স ও পরবর্তীতে প্রেফেসর ম্যাগ ইউরির তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও ব্রায়ান মাওর কলেজে থাকাকালীন তনিমার সৌভাগ্য হয় নাসা (NASA)-র সাথে কাজ করার।

নাসার স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইন্সটিটিউটে ইন্টার্ন করার সময় সময় হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে ওরিয়ন নেবুলার চিত্রায়ণ করে সেসময় বিজ্ঞান সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন নতুন বিষয়ের সাথে শিখতে হয়েছে। এমনকি কম্পিউটার কোডিংও। এ সময় তিনি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত সংকেতগুলোকে নিজের বোধগম্য করে তুলতেন।

২০১২ সালে তার অর্জন তালিকায় যোগ হয় আরও একটি সাফল্য।

ইউরোপিয়ান পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা সার্ন (CERN)-এর সাথে প্রথম বাংলাদেশি হিসেব কাজ করার সুযোগ পান তিনি।

SN-10

SN-10 তালিকার মাধ্যমে সায়েন্স নিউজ চেষ্টা করে সেসব উদীয়মানদের তুলে আনতে যাদের কাজ বিজ্ঞানের পরিধিকে প্রসার করতে সহায়তা করে। এই তালিকায় তারাই প্রাধান্য পায় যারা বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনে অসাধারণ কিছু করে দেখান। এই তালিকা প্রনয়ণে সহায়তা করেন খ্যাতিমান নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী, আমেরিকান ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য ও বিগত এসএন-টেন তালিকায় থাকা বিজ্ঞানীরা।

তনিমার গবেষণা

নক্ষত্রের জীবনচক্রের একটি ধাপ ব্ল্যাকহোল। বিজ্ঞানের জগতে অনন্য এক রহস্য। মহাবিশ্বের অনেক ঘটনার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এরা। তাই আমাদের গ্যালাক্সি কিংবা দূরবর্তী কোনো গ্যালাক্সি সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানতে হলে প্রয়োজন ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। কিন্তু ব্ল্যাকহোল এমনই এক রহস্যময় বস্তু যার ভেতর থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। আলো না আসলে বলা যায় সরাসরি কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা দিয়েছে কেবল বিভিন্ন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

সম্প্রতি তনিমা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) প্রযুক্তি ব্যবহার করে রহস্যময় সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের অসাধারণ কিছু চিত্র তৈরি করেছেন। সেই সাথে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে এই ব্ল্যাকহোলগুলো সময়ের সাথে বেড়ে উঠে, কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করে, কীভাবে বেঁচে থাকে, কীভাবে মহাকাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

তনিমা বর্তমানে ডার্থ মাওথ কলেজে প্রফেসর রায়ান হিকোক্স গ্রুপে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে আছেন। কাজ করছেন এজিএন এক্সরে প্যারামিটার নিয়ে। ভবিষ্যতেও তিনি ব্ল্যাকহোল নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে চান। উন্মোচন করতে চান মহাবিশ্বের আরও অনেক অজানা রহস্য।

তনিমা বাল্যকালে মহাকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার এই স্বপ্নের সারথি হিসেবে পেয়েছিলেন বাবা-মাকে। পরিবারের একটু সদিচ্ছা আর নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে আজ তিন হাঁটছেন স্বপ্নের পথে।

সূত্রঃ roar.media, জানুয়ারি ১ ২০২১

বিসিএস প্রস্তুতি শুরু থেকেই যা করবেন

বিসিএস এমন একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, যার প্রস্তুতি নিলে বাকি সব চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনযাপন, পড়াশোনা, সময় ব্যবস্থাপনা–সব কিছু প্রস্তুতির শুরু থেকেই করতে পারলে পরে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে আর ঝামেলা পোহাতে হবে না। পরামর্শ দিয়েছেন ৩৮তম বিসিএস অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রণয় কুমার পাল

বিসিএসের প্রস্তুতির শুরুর দিকে অনেকের মধ্যেই সিরিয়াসনেস দেখা যায় না। তাই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো–নিজেকে 'পরীক্ষার্থী' মনে করা। এই পরীক্ষাকে একাডেমিক পরীক্ষার মতো আবশ্যিক মনে করে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। বিসিএস সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। তাই প্রার্থীকে অবশ্যই সিরিয়াস হতে হবে। এর জন্য শুরুতেই বইয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি সময় ব্যবস্থাপনা, দৈনন্দিন জীবনযাপন–সব কিছুই প্রস্তুতির অনুকূলে আনতে হবে। অতিপ্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

বন্ধু হোক প্রস্তুতির সঙ্গী

বিসিএসের জন্য বন্ধু নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন, যাঁরা আপনার মতোই বিসিএস বা ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রার্থী; আর প্রস্তুতির দিক থেকেও তাঁরা অগ্রগামী। এসব বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিলেও ঘুরেফিরে প্রস্তুতিসংক্রান্ত বিষয়গুলোই উঠে আসবে। জটিল কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। ভার্চুয়াল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এ ধরনের বন্ধু বেশ উপকারী। তাঁদের সঙ্গে প্রস্তুতির বিষয়বস্তু নিয়ে শেয়ার করুন, অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন। এতে পড়ার আগ্রহ বাড়বে, কঠিন বিষয়গুলোও খোলাসা হবে।

লক্ষ্য কী?

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি স্যার এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, 'স্বপ্ন তা নয়, যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন তা-ই যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।' কখনো ভাববেন না, বিসিএসে এত পরীক্ষার্থী, আমার কী হবে! মনে রাখবেন, যাঁরা বিসিএসে সফল হয়েছেন, তাঁরাও আপনারই মতো। তবে তাঁরা তাঁদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে সফল হতে পেরেছেন। আরেকটি কথা, যদি বিসিএসই আপনার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহলে অন্য কোথাও চাকরিতে ঢোকার আগে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিন।

সফলদের গল্প অনুপ্রেরণা দেবে

একটি বড় স্বপ্ন দেখার জন্য কিছু স্বপ্নচারী সফল মানুষের গল্প শুনুন। কালের কণ্ঠ'র চাকরি আছে পাতায় বিসিএস ক্যাডারদের গল্প প্রকাশ হয়। এগুলো পড়তে পারেন। ফেসবুকে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। তাঁদের অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন লেখা নিয়মিত পোস্ট করেন। আরেকটি কথা মনে রাখবেন– সফল বা ব্যর্থ ব্যক্তিরা সামর্থ্যের দিক থেকে খুব বেশি ভিন্ন হয় না। তাঁরা শুধু ভিন্ন হয় তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায়। কথাটি বলেছেন মার্কিন লেখক, বক্তা ও যাজক জন ম্যাক্সওয়েল।

অবসর কাজে লাগান

একটানা পড়তে কারোরই ভালো লাগে না। তাই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা অবসর বা বিনোদনও জরুরি। আপনি এই বিনোদনগুলোকেও বিসিএসের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। সে সময় আপনি ইউটিউবে বিসিএস সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে পারেন, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য শুনতে পারেন অথবা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বা বাংলা সাহিত্যকেন্দ্রিক মুভি দেখতে পারেন। আমার বিসিএস ভাইভায় কাঙ্গাল হরিনাথকে নিয়ে একটি প্রশ্ন করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্রের কথা আমার মাথায় আসে। সেখানে হরিনাথের একটি দৃশ্য আছে। প্রশ্নের উত্তরটি আমি ঠিকভাবে দিই। তাই এ বিষয়গুলো প্রিলি, রিটেন, ভাইভা যেকোনো পরীক্ষায়ই আপনাকে সাহায্য করতে পারে। তাই এ ধরনের সুস্থ বিনোদন চর্চা করুন, যা আপনার বিসিএস প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হবে।

পত্রিকা পড়ুন, আপডেট থাকুন

নিয়মিত পত্রিকা পড়ে আপডেট থাকুন। বাংলা ও ইংরেজি দুই ধরনের পত্রিকাই পড়ার চেষ্টা করবেন। পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আপনার লেখার দক্ষতা, ভোকাবুলারি, অনুবাদ করার ক্ষমতা, ইংরেজি পড়ে দ্রুত বোঝার ক্ষমতা বাড়াবে। দরকারি তথ্য টুকে রাখার জন্য একটা নোট খাতা রাখুন, যেখানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শব্দ সুবিন্যস্তভাবে লিখে রাখতে পারবেন।

পড়ার টেবিলে মন বসান

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমরা বিভিন্ন কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। তাই আমাদের সময়ের একটা বড় অংশ সেগুলোর পেছনে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করেও বিভিন্ন কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকায় একমনে পড়তে পারি না। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত টিউশনি করে পড়ার সময়ই পান না।

বিসিএস প্রার্থী হিসেবে আপনাকে সেগুলোর পেছনে অতিরিক্ত সময় দেওয়া থেকে বিরত থেকে পড়ার টেবিলে সময় দিতে হবে। বিসিএস শুধু মেধাবীদের জন্য নয়, বিসিএস ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী মেধাবীদের জন্যও। তাই পড়ার টেবিলে মন দিন আর পড়ার সময় যেন মনোযোগ বিঘ্ন না হয়, সে জন্য গেম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অংশগ্রহণ কমিয়ে দিন।

প্রস্তুতিতে ইন্টারনেট কাজে লাগান

তবে হ্যাঁ, বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট পড়ালেখার এক অনন্য সহায়ক, যদি এর সদ্ব্যবহার করি। যে-কোনো বিষয়ে তত্ত্ব বা তথ্যের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করুন। বিসিএস প্রস্তুতিতে ইউটিউব ও গুগল আপনাকে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। গণিত, বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি থেকে শুরু করে সব বিষয়েই আপনি এগুলো থেকে সাহায্য নিতে পারেন। গুগল প্লেস্টোরে বিভিন্ন অ্যাপ পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আলাদা নোট খাতায় বা বইয়ের পাশেই ছোট করে লিখে রাখতে পারেন; তাহলে পরবর্তীকালে রিভিশন দিতে সুবিধা হবে।

মোট কথা, বিসিএসে সাফল্য পেতে হলে আপনাকে বিসিএসকেন্দ্রিক একটা জীবনধারা তৈরি করতে হবে। যে চাকরিটা আপনি আগামী ৩০ বছর ধরে করবেন, যা আপনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, তার জন্য তো আপনাকে দু-তিনটা বছর পরিশ্রম করতেই হবে।

শ্রুতলিখন : এম এম মুজাহিদ উদ্দীন

কালের কণ্ঠ, ৫ ডিসেম্বর ২০২০

প্রেজেন্টেশনের এ টু জেড

দ্বিতীয় পর্ব

একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৮০% মানুষ প্রেজেন্টেশন দিতে ভয় পায়। তাহলে বাকি ২০% মানুষ কি খুবই সাহসী? না, আসলে তারা মিথ্যা কথা বলছে।

জীবনে যারা একবার হলেও প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন তাদের বেশিরভাগেরই অভিজ্ঞতা খুবই ভয়ানক। আমারও মনে আছে আমি যেদিন প্রথম প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলাম সেদিন আমার হাত, পা কাঁপাকাপি শুরু হয়ে গিয়েছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। খুবই নার্ভাস ছিলাম। প্রথম প্রথম এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সারাজীবন আমরা এভাবে কাটিয়ে দিতে পারি না। এই ভয়কে বশে এনে ভালো প্রেজেন্টার হওয়াটা অনেক বেশি জরুরি।

কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকে কর্পোরেট জীবনের শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া, প্রতিযোগিতা বা আরো নানা কাজে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। যদি আমরা ভালো প্রেজেন্টেশন দেয়ার কৌশলগুলো রপ্ত করতে পারি, তাহলে জীবনের এসব অধ্যায়ের ইতিহাস এবং পথচলা হতে পারে গৌরবোজ্জ্বল। তাই সবাই যাতে আত্মবিশ্বাসের সাথে, খুব সহজভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে পারে সেজন্য আমি অসাধারণ কিছু আইডিয়া শেয়ার করা হলো।

Body language in a presentation

এটা প্রেজেন্টেশনের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। Bodz language হলো মুখ দিয়ে কথা বলা ছাড়া যেটা চোখ, হাত-পা বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিমার সাহায্যে আমাদের মনের ভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে। প্রেজেন্টেশনে মানুষের মুখের কথার চাইতে Bodz language অনেক বেশি শক্তিশালী। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে মানুষ যখন কথা বলে তার ৪৫-৫৫ ভাগ Bodz language দিয়েই বলে।

এখন আমি আলোচনা করব কীভাবে Bodz language-কে খুব ভালোভাবে presentable করা যায়।

১. Posture

তুমি কিভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে আছো সেটাই তোমার Posture। প্রেজেন্টেশনে অনেকেই বাঁকা হয়ে, ঝুঁকে বা হেলে যায়। এটা Confidence কমিয়ে দেয় এবং দেখতে খুব খারাপ লাগে। Posture ঠিক রাখার একটা ছোট্ট Trick হলো সবসময় তোমার কাঁধ বা Shoulder Straight রাখবে। এতে তোমার posture ভালো দেখা যায়।

২. Gesture

হাত পা নেড়ে কথা বলা, চোখ দিয়ে ইশারা করা, মাথা এদিক ওদিক ঘোরানো এগুলো হলো Gesture। এটা মানুষকে শক্তি দেয়। ভালভাবে করতে পারলে এটা Audience-দের মাঝে একটা positive impact সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এ জিনিসটাকে ভালোভাবে Handle করতে পারে না। এক্ষেত্রে হাত দুটোকে মুষ্টিবদ্ধ রেখে Firmly কথা বলতে হয়। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা Gesture দেয়ার ভঙ্গিমাগুলো আয়ত্ব করে নিতে পারো।

৩. Movement

কেউ কেউ প্রেজেন্টেশন দেয়ার সময় খুব দ্রুত হাঁটাহাঁটি করে, আবার অনেকে একই জায়গায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই প্রেজেন্টারকে দেখলেই মনে হয় খুব নার্ভাস। এসময় করণীয় হলো খুব সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর Movement এর সময় ধীরে ধীরে বা Smoothly হাঁটা। এতে Audience-দের তোমার উপর চোখ রাখতে সুবিধা হবে, তোমাকে দেখতে ও খুব কনফিডেন্ট লাগবে।

Eye Contact In a presentation

আমরা Audience এর সাথেই যে কথা বলছি, সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় 'Eye Contact' এর মাধ্যমে। Audience এর সাথে 'Eye Contact' না রাখলে তারা মনে করবে না যে আমরা তাদের সাথেই কথা বলছি। কিন্তু বিশাল একটা Audience এর সাথে Eye Contact করা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। বিশেষ করে নতুন প্রেজেন্টারদের জন্য এটা খুব একটা ভয়ের ব্যাপার।

আজ আমি ৩টি উপায় বলব যেগুলো দিয়ে খুব সহজে সব Audience এর চোখের দিকে না থাকিয়ে ও 'Eye Contact' Maintain করা যায়।

১. Know the Stage

প্রেজেন্টেশন দেয়ার আগে Stage এ উঠে একটু হাঁটাহাঁটি কর যাতে বুঝতে পারো আসলে Audience টা কত বড় এবং কোন জায়গায় কী কী আছে। এর ফলে জায়গাটা পরিচিত হয়ে যাবে এবং তুমি একটু Comfortable feel করবে।

২. Select people

সবার দিকে তাকানোর দরকার নেই। তোমার ৪ জন বন্ধুকে ৪ কোণে বসিয়ে দাও অথবা ৪ কোণের ৪ জন সিলেক্ট কর। প্রেজেন্টেশন শুরু করার পর একবার সামনে ডানে, পিছে বামে আবার সামনে বামে, পিছে ডানের বন্ধুর দিকে তাকাবে। তাহলে মনে হবে তুমি পুরো Audience এর দিকেই তাকাচ্ছ।

৩. Select Points

মানুষ সিলেক্ট না করেও চার কোণায় ৪টা নির্দিষ্ট পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারো। যখন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে তাকাবে তখন ঐ পাশের Audience-রা মনে করবে তুমি তাদের দিকেই তাকিয়ে আছো। এভাবে তুমি মানুষের চোখের দিকে না তাকিয়েও Eye Contact maintain করতে পারবে।

Dress Code in a presentation

ভালো প্রেজেন্টেশন দেয়ার পাশাপাশি নিজেদেরকে সুন্দরভাবে Show করাও অনেক বেশি জরুরি। বেশিরভাগ মানুষ তোমার Dress Code দেখে তোমাকে Judge করবে। তুমি কত দামী বা সুন্দর কাপড় পর সেটার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তুমি কাপড়গুলো দিয়ে নিজেকে কীভাবে Dressed up করো সেটা। চলো দেখে নিই কীভাবে তুমি একটা 'Proper 'Dress Code' maintain করতে পারো।

Male

ছেলেদের জন্য Dress Code টা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Formal Dress দিয়ে প্রেজেন্টেশন দেয়া উত্তম। চাইলে Semi formal dress দিয়েও প্রেজেন্টেশন করা যায় তবে কখনোই Casual dress দিয়ে করা যাবে না। Formal Dress এর কিছু etiquette নিয়ে আলোচনা করি।

১. Tie length

Tie Length এমন হওয়া উচিত যাতে Tie এর শেষ প্রান্ত বেল্টের শুরুর অংশকে হালকাভাবে স্পর্শ করবে। এর চেয়ে ছোট বা লম্বা হলে দেখতে খারাপ লাগবে।

২. Belt and Shoes

মনে রাখবে বেল্ট এবং জুতার কালার সবসময় একই হতে হবে। যেমন জুতা যদি ব্রাউন হয়, বেল্টও ব্রাউন হতে হবে।

৩. Suit

স্যুটের যদি দুটা Button থাকে, তাহলে নিচের বাটন কখনও লাগাবে না এবং প্রেজেন্টেশন দেয়ার সময় বাটন কখনো লাগাবে না। Button লাগানো থাকলে মনে হবে কেউ তোমাকে চেপে ধরে রেখেছে এবং এতে সহজে সড়াব করতে পারবে না।

Female

মেয়েদের Dress Code অনেকটাই শিথিল। তাদের জন্য দুটা উপদেশ দেব। ১. যেকোনো কাপড় পরতে পারো তবে সেটা যেন ভদ্র দেখায় এবং 'FLASHY COLOR' না হয়।

২. সবসময় যথাসম্ভব 'Ornament & Jewelry' বর্জন করো। এগুলো যত কম ব্যবহার করবে তত বেশি Formal এবং Sober লাগবে।

বেরিয়ে এসো নিজের খোলস থেকে!

প্রেজেন্টেশান দেয়ার সময় কিছু ট্রিক্স তোমার প্রেজেন্টেশানকে করে তুলবে আরও আকর্ষণীয়।

আরও জানতে নিজেই ঘুরে এসো ১০ মিনিট স্কুলের এক্সক্লুসিভ এই প্লেলিস্টটি থেকে।

You are Presenting Even when you Are not Speaking

একটা Team এ যদি ৫ জন মেম্বার থাকে এবং সেখান থেকে যদি একজন প্রেজেন্ট করে,বাকি ৪ জন Speaking না করলেও তারা As a team নিজেদেরকে Present করে। কারণ Audience রা পুরো Team কে Observe করে। তাই বাকি ৪ জন নিজেদের মধ্যে কথা বলা, ঠেলাঠেলি করা বা অন্য কোন awkward কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেই সাথে নিচের উপদেশগুলো অনুসরণ কর–

১. Approval Nods

ধর, তোমার Team member যখন প্রেজেন্টেশন দেয় তখন তুমি তার কথার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা ঝাকাচ্ছ, এটাই হলো Approval Nods| এটা করলে তোমার বন্ধুটির সাহস বেড়ে যাবে এবং Audience ভাববে তোমরা আসলেই একসাথে ভালমতো কাজ করেছ।

২. Smile

এটাও Approval nods-এর মতই কাজ করে। মনে করো তোমার ফ্রেন্ড প্রেজেন্টেশনে একটা Joke বলল। তুমি সবার সাথে বন্ধুকে সম্মতি জানিয়ে একটা হাসি দিলে। এতে তোমার বন্ধু যেমন সাহস পাবে তেমনি Audience, Team Coordination সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা পাবে।

৩. Assist

যে প্রেজেন্ট করে তার অনেক সময় Slide Change করা, ভিডিওতে Shift করা বা অন্যান্য অনেক কাজ করতে হয়। এসব কাজ যদি প্রেজেন্টার নিজে করে তাহলে প্রেজেন্টেশনের Smoothness নষ্ট হয়ে যায়। তাই তুমি দাঁড়িয়ে না থেকে তোমার ফ্রেন্ডকে এসব কাজে সাহায্য করো।

PowerPoint Hacks During a Presentation

White or Black screen

প্রেজেন্টেশন চলাকালীন সময়ে আমাদের অনেকসময় একটা White or Black screen এর দরকার পড়ে। এই কাজটা এক ক্লিকেই করা যায়। White screen এর জন্য-keyboard এর W press করো, White screen চলে আসবে। পুনরায় ফিরে আসতে চাইলে আবার W press করো, আগের লেখায় চলে আসবে। Black Screen এর জন্যও GKB process, তবে তখন ড এর জায়গায় ই চাপতে হবে।

Jump to Slide Number

প্রেজেন্টেশন চলাকালীন সময়ে বা Q&A সেশনে এক স্লাইড থেকে অন্য স্লাইডে যেতে হবে। ধরো ১০ নাম্বার থেকে ১ নম্বর স্লাইডে যাবে। এজন্য একটা একটা করে change না করে সরাসরি Jump করতে পারো। কী-বোর্ডে Slide Number press করে 'Enter' button চেপে Jump করা যায়। তুমি যদি ১০ নম্বর Slide এ থাকো তাহলে ১ লিখে Enter দিলেই ১ এ চলে যাবে।

এছাড়াও http://www.slideshare.net/mobile/search/slideshow?q=Ayman+Sadiq এই লিংকে গিয়ে আরো অনেক মজার মজার presentation Hacks শিখতে পারো।

[চলবে]

প্রকল্প সংবাদ

অভিনন্দন!!

প্রকল্পের ২০০৫ এইচএসসি ব্যাচের সদস্য মো. মারুফ বিল্লাহ সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রোটেকনোলজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার বিভাগ থেকে ২০১১ সালে সিজিপিএ ৩.৮৬ সহ স্নাতক (সম্মান) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে সিজিপিএ ৩.৯০ সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাবুলিয়া জেএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে ২০০৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৭৫ এবং ২০০৫ সালে শহীদ স্মৃতি কলেজ, সাতক্ষীরা থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৬০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনের শুরুতে মো. মারুফ বিল্লাহ ২০১৫ সালে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে সেখানে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। NST Fellowship, Bangladesh এর আওতায় ২০১২-১৩ সালে 'Adaptation of Farming Practices by the Smallholder Farmers in Response to Climate Change' শীর্ষক গবেষণা গবেষণা প্রকল্পের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন। International Journal of Science and Research (IJSR) সহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তার একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে আমরা গর্বিত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

প্রকল্পের ২০০৫ (এইচএসসি) ব্যাচের সদস্য মো. গাজীউল হক ৩৪তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস, বগুড়া-তে বীজ প্রত্যয়ন অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ২০১৪ হতে ২০১৬ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশনে উপসহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মো. গাজীউল হক হাজী মোহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৯ সালে সিজিপিএ ৩.৫৭ সহ বিএসসি এজি (অনার্স) এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা হতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়ে ২০১২ সালে সিজিপিএ ৩.৮৬ সহ এমএস সম্পন্ন করেন। তিনি কেরানীরহাট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর থেকে ২০০৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৪০ এবং ২০০৫ সালে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৮০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

'আজিজুল হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা'র ফলাফল নির্ধারণ

মেধা লালন প্রকল্পের বর্তমান সদস্যদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০১০-'১১ সালে 'আলমগীর এম.এ.কবির স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা', ২০১২-'১৩ সালে 'ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা' এবং ২০১৪-'১৫ সালে 'ড. আব্দুল্লাহ ফারুক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা', ২০১৭-'১৮ সালে 'এম. শামসুল হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা', ২০১৮-'১৯ সালে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা'র সফল আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-'২০ সালে ৬ষ্ঠ বারের মতো একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের প্রয়াত সদস্য আজিজুল হক স্মরণে এবারের প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয়েছিল 'আজিজুল হক স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা' এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল 'বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পুরুষ ও নারী কৃষকের ভূমিকা'। বাংলায় ২০০০ শব্দের মধ্যে নিজ হাতে লিখিত রচনা আহ্বানের পর মেধা লালন প্রকল্পের সদস্য ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে ৪৮টি রচনা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত রচনাগুলো যথাযথভাবে যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করেন রচনা মূল্যায়ন কমিটির দুজন সম্মানিত সদস্য যথাক্রমে ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ এবং ড. রওশন আরা ফিরোজ। তাদের দেয়া নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফলে এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন প্রকল্পের ২০১১ ব্যাচের সদস্য আয়শা সিদ্দিকা, সদস্য নং: ৯৩০/২০১১ (বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত); দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন মো. সাইদুর রহমান, সদস্য নং: ৯৯৭/২০১২ (শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতি বিভাগে ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত); এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মোছা. খাদিজা আক্তার খুশিমনি, সদস্য নং: ১১৫০/২০১৫ (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত)। উল্লেখ্য, এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার হচ্ছে যথাক্রমে ১০,০০০/-, ৮,০০০/- ও ৫,০০০/- টাকার চেক, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট। রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সকল সদস্যকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন!!

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৭ (ছাত্র)

ক্রমিক	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১	মো. আশিকুর রহমান ১২৯৬/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস, ১ম বর্ষ।
২	মো. রাশেদ হাসান ১২৯৭/২০১৭ মিঠাপুকুর, রংপুর।	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, পদার্থ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ।
৩	আবু তাহের ১২৯৮/২০১৭ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি, ১ম বর্ষ।
৪	মো. আক্কাসুর রহমান ১৩০০/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সরকারি আলিমুদ্দিন কলেজ, লালমনিরহাট, বাংলা, ১ম বর্ষ।
৫	মো. জামিয়ার রহমান ১৩০১/২০১৭ কুকড়াডাঙ্গা, নীলফামারী।	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস, ১ম বর্ষ।
৬	মো. জিয়ারুল ইসলাম ১৩০২/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম বর্ষ।
৭	মো. এনামুল হক ১৩০৩/২০১৭ মিঠাপুকুর, রংপুর।	বদরগঞ্জ সরকারি কলেজ, রংপুর, ব্যবস্থাপনা, ১ম বর্ষ।
৮	মো. রেজওয়ান হোসেন রাব্বী ১৩০৪/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সরকারি আলিমুদ্দিন কলেজ, লালমনিরহাট, ইতিহাস, ১ম বর্ষ।
৯	মো. সজীব মিয়া ১৩০৫/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ঢাকা কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ।
১০	মো. আল রাব্বী হাসান নিরব ১৩০৬/২০১৭ কুড়িগ্রাম।	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর, গণিত, ১ম বর্ষ।
১১	মনোজ সাহা ১৩০৭/২০১৭ তেরখাদা, খুলনা।	সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা, হিসাববিজ্ঞান, ১ম বর্ষ।
১২	গোলাম রব্বানী সুজন ১৩০৮/২০১৭ সদরপুর, ফরিদপুর।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ।
১৩	মো. নাঈমুল ইসলাম ১৩১০/২০১৭ মির্জাপুর, টাংগাইল।	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জি. ১ম বর্ষ।
১৪	মো. সামিউল ইসলাম ১৩১১/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, রসায়ন, ১ম বর্ষ।
১৫	মো. শাহীন খান ১৩১২/২০১৭ চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি, ১ম বর্ষ।
১৬	শেখ সালমান কবীর ১৩১৩/২০১৭ দাকোপ, খুলনা।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও গবেষণা, ১ম বর্ষ।
১৭	মো. মেহেরুল ইসলাম ১৩১৫/২০১৭ কুড়িগ্রাম।	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস, ১ম বর্ষ।
১৮	মো. আরাফাত আমিন ১৩১৭/২০১৭ উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রসায়ন, ১ম বর্ষ।
১৯	মো. নেওয়াজ উদ্দিন ১৩১৮/২০১৭ গুরুদাসপুর, নাটোর।	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস, ১ম বর্ষ।
২০	মো. সোহানুর রহমান (শান্ত) ১৩১৯/২০১৭ ডোমরা, নীলফামারী।	সৈয়দপুর সরকারি কলেজ, নীলফামারী, সমাজবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ।
২১	মো. রাসেল বাবু ১৩২১/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা, ১ম বর্ষ।
২২	শরৎ চন্দ্র বর্মন ১৩২৩/২০১৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	চট্টগ্রাম টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ৩য় বর্ষ।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে!

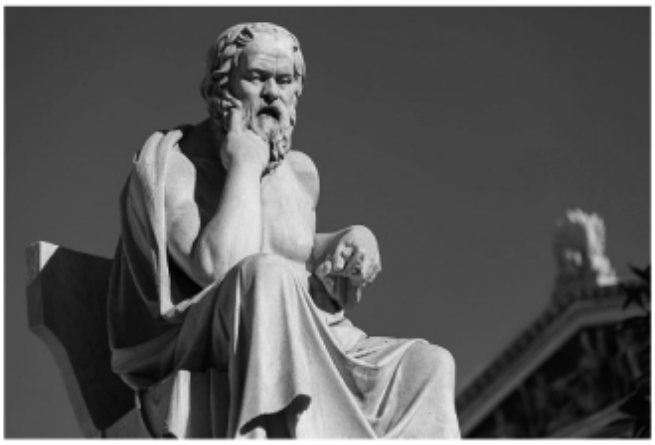

‘Know thyself’– নিজেকে জানো বলতে কী বোঝানো হয়?

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলতেন, Know thyself. অর্থাৎ নিজেকে জানো। জীবন চলার পথে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হলো ‘নিজেকে জানা।’ আপনি যতদিন না নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবেন, ঠিক ততোদিন আপনি আপনার জীবনের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো সঠিক সময়ে নিতে পারবেন না। ‘নিজেকে জানা’ হলো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর।

অন্য একজন মানুষ আমাকে হয় আমার বাবার নামে চেনে, নইলে মায়ের নামে চেনে, নইলে আমার নামে চেনে, নইলে আমার কোনো গুণের জন্য চেনে, নইলে আমার কোনো বদগুণের জন্য চেনে। কিন্তু আমি আমাকে কতটা জানি? ব্যাপারটি অনেকটা কোনো পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েও সম্পূর্ণ উত্তর করতে না পারার মতো। কিছু প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়ে যায়। খেয়াল করে দেখবেন, রোজ ব্যবহার করা ঘড়ি আমরা রোজ দেখি, কিন্তু হঠাৎ করে যদি সেই ঘড়ি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় দেখবেন, অনেকে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেন না, নইলে সঠিক উত্তর দিলেও সংশয় নিয়ে দেয়। তবে সবাই না, কারণ এটি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ। নিজেকে জানার মানে দুইরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে, এক হচ্ছে ভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া-কম্পন এসব দ্রষ্টা রূপে জানা অর্থাৎ ধরুন হাঁটুটাতে একটু লাগছে, সেটা দ্রষ্টা রূপে দেখা, ও অনিত্য জ্ঞানে ভোগ না করা। বা কোনো কারণে খুব খুশি বা কোনো কারণে খুব দুঃখী–কোনোটাই ভোগ ভাবে না দেখে দ্রষ্টা ভাবে অনিত্য জ্ঞানে দেখে নিজেকে অবিচল রাখা। আরেকটি হল এই অভ্যাস করতে করতে নিজে বা নিজেরা যে পরমব্রহ্মাহের অংশ তার জ্ঞান চিত্তের গভীরে প্রোথিত করা। সহজ ভাবে এ কথাটির অর্থ, নিজে, নিজেকে জানা। নিজের ভালো দিক সম্পর্কে, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে, নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে, নিজে অবহিত হওয়া। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে নিজে সজাগ থাকতে পারলে, নিজের সমালোচনা নিজে করতে পারলে, নিজেকে নিজে জানার পথটি সুগম হয়ে উঠে।

‘দ্য লাস্ট সাপার’ ছবিটা কী?

দ্য লাস্ট সাপার বা শেষ নৈশভোজ হল ইতালীয় চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত দেয়াল চিত্রকর্ম। মোনালিসার পর এটিই লিওনার্দোর সেরা শিল্পকর্ম হিসেবে ধরা হয়। ১৪৯৫-১৪৯৮ সালের মধ্যে এই ছবিটি আঁকা হয়। দ্য লাস্ট সাপার চিত্রটি বর্তমানে শোভা পাচ্ছে ইতালির মিলানের সান্তা মারিয়া দেলে গ্রাজির ডাইনিং হলের পিছনের ১৫ ফুট বাই ২৯ ফুট দেয়ালজুড়ে। সেইন্ট জনের গোসপেলের ১৩:২১ অধ্যায়ে বর্ণিত যিশুখ্রিস্টের শেষ দিনগুলোর একটিকে স্মরণ করে আঁকা হয়েছে দ্য লাস্ট সাপার ছবিটি। ছবিটির প্রাথমিক বিষয় বস্তু হল যিশুখ্রিস্ট ও তার বারো জন শিষ্য নৈশভোজ সারছেন। ভোজের মধ্যেই যিশু ঘোষণা করেন এই শিষ্যদের মধ্যে থেকে একজন তার সাথে বিশ্বাঘাতকতা করবেন; সে মুহূর্তটির কাল্পনিক ছবিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই চিত্রে। ছবিতে অনুসারীদের ভিতরে যে আতঙ্ক, ক্রোধ আর হতবিহ্বলতা ছুঁয়ে গেছে তাই-ই ফুটিয়ে তুলেছেন ভিঞ্চি। ছবিতে যিশুকে মাঝখানে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তার শিষ্যদের তিনজনের একেকটা দলে বিভক্ত করা হয়েছে। দা ভিঞ্চি যিশুর মুখ ফুটিয়ে তোলার জন্য দীর্ঘ সময় নিয়েছিলেন, যাতে যিশুর মুখে একটা অভিব্যক্তিহীন আবহ ফুটিয়ে তোলা যায়।

The Last Supper, Leonardo da Vinci .